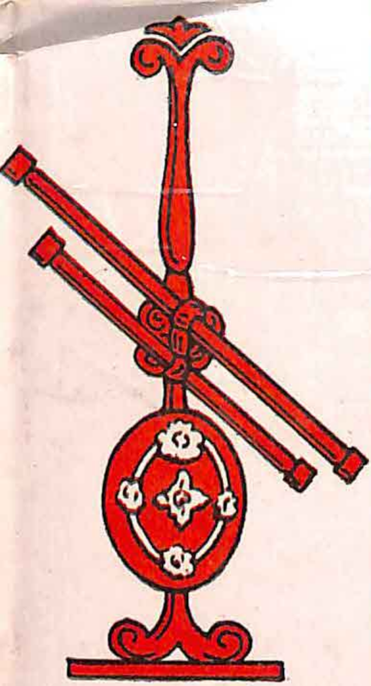
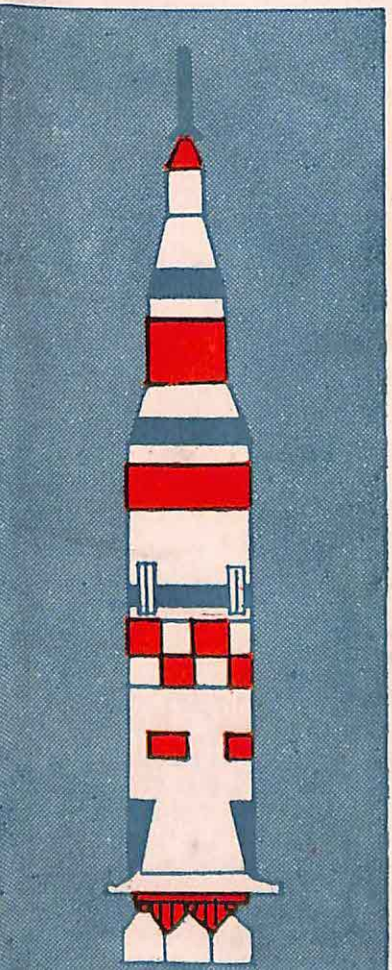
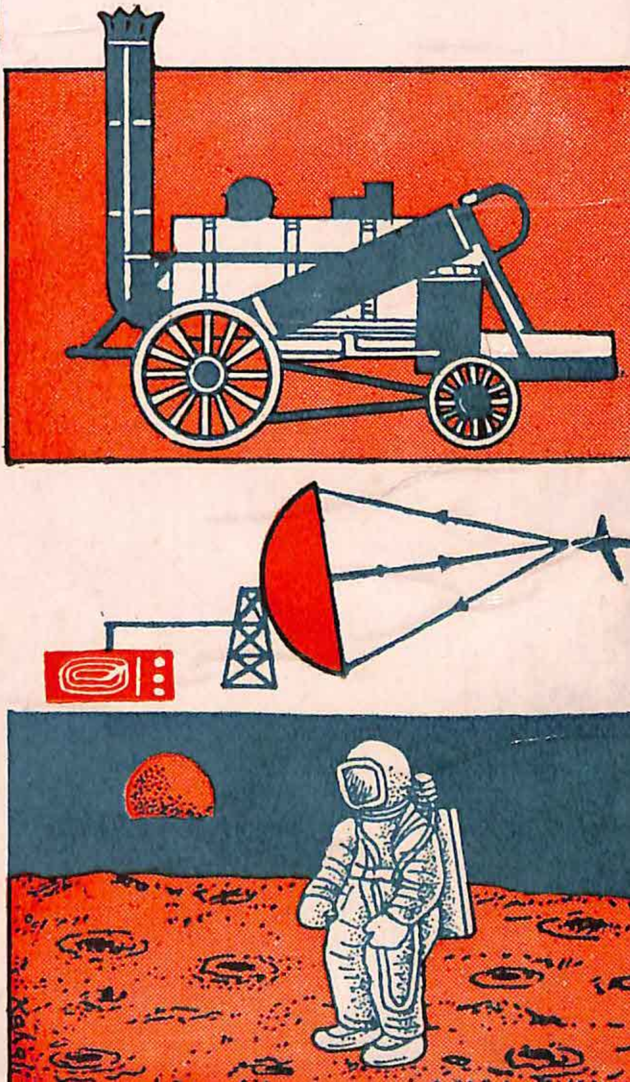


বিজ্ঞান বিচিত্রা





বিজ্ঞান-বিচিত্রা

ভুবনমোহন ভট্টাচার্য

ভারত পাবলিশার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৩, কলেজ রো, কলি-৯

প্রকাশিকা :
স্বাতী ভট্টাচার্য
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৯

মুদ্রাকর :
নিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯-এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

॥ আকাশের বিচিত্র তথ্য ॥

রাত্রের আকাশ দেখতে খুবই সুন্দর।

একদিকে উজ্জ্বল চাঁদ স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে···আর অসংখ্য ছোট্ট জোনাকির আলোর মতো তারারা মিটমিট করছে।

এই তারাদের সত্যিকারের পরিচয় কি? তাদের আমরা নক্ষত্র বলেও ভাবতে পারি।

নক্ষত্ররা জোনাকির মত মিটমিট করলে কি হবে? ওরা আসলে আকারে প্রকাণ্ড, সূর্যের মতই ওদের চেহারা। তেজ। আবার দেখা যায় কোন কোন নক্ষত্র সূর্যের চেয়েও অনেক গুণ বড়। এক একটি নক্ষত্রের মধ্যে লক্ষ কোটি পৃথিবী এঁটে যেতে পারে।

কিন্তু আকাশের থেকে ওরা অনেক দূরে আছে বলে ওদের অত ছোট দেখায়। আর দূরত্বও কি যেমন তেমন? পৃথিবী থেকে সূর্য ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে, কিন্তু নক্ষত্র তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে আছে। এই দূরত্ব কতটা তার একটা ধারণা দেওয়া যাক।

ট্রেনে চড়ে অনেকেই তো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়।

সাধারণ ট্রেনগুলি এক ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বা ৪০ কিলোমিটার বা খুব বেশি হলে ৬০ কিলোমিটার যায়। আর সাধারণত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার থেকে ১০০ কিলোমিটার যায়।

কিন্তু এমন যদি কোন ট্রেন ধরা যায়, যা প্রতি সেকেণ্ডে ১০০০ কিলোমিটার যায় অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় ৩৬ লক্ষ কিলোমিটার যায়, তাহলে ঐ ট্রেনটি অবিরাম চলে প্রায় দুদিনে সূর্যতে পৌছবে। আর, এ রকম ট্রেনে করে আমাদের নক্ষত্রে পৌছতে লাগবে প্রায় ২০০০ বছর। বেশীর ভাগই নক্ষত্র এর চেয়ে অনেক দূরে আছে।

অত্যন্ত দূরে আছে বলেই এদের আলো এত ক্ষীণ হয়ে আমাদের কাছে আসে।

সূর্যকে আমরা দেখেছি—তাকে সূর্য বলেই আমরা জানি। কিন্তু সূর্যও একটি নক্ষত্র। কিন্তু সূর্য আমাদের অনেক কাছে, তার আলো ও উত্তাপ এত বেশী মনে হয়। যদি একটি মোমবাতির সামনে আমরা বসে থাকি তাহলে তার আলো ও উত্তাপ দুই-ই পাব। কিন্তু মোম-বাতির থেকে যদি অনেক দূরে বসে থাকি তাহলে তার মৃদু আলোই শুধু আমাদের চোখে পড়বে, কিন্তু উত্তাপ কিছুই আমরা বুঝতে পারব না।

নক্ষত্ররা সবসময়েই আলো দিচ্ছে, কিন্তু দিনের বেলায় সূর্যের প্রচণ্ড আলোতে তাদের দেখা যায় না। যেমন, দিনের বেলায় টর্চের আলো জ্বালালে তা বোঝা যায় না। সূর্য এবং নক্ষত্রগুলি থেকে অফুরন্ত তেজ সর্বদা ছড়িয়ে পড়ছে। এবং প্রচণ্ড 'উত্তাপ'। এদের উত্তাপ এত বেশী যে তাদের মধ্যে কিছু পদার্থ আর কঠিন বা তরল নেই, সব কিছু পদার্থ সেখানে বাষ্পের মত হিম হয়ে আছে।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার যত গাঢ় হয়ে আসতে থাকে, আকাশের বুকে ফুটে উঠে থাকে অসংখ্য নক্ষত্র। আমরা খালি চোখে মাত্র কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই। কিন্তু দূরবীন নামে কাঁচের তৈরী যন্ত্র দিয়ে অনেক বেশী নক্ষত্র দেখা যায়। এই নক্ষত্ররা যদিও আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবুও কিছু কিছু নক্ষত্র আকাশে কোথাও জোট বেঁধে আছে। ঐ জোটগুলি কখনও কখনও বিশেষ একটা চেহারা নেয়।

নক্ষত্রের চেনার সুবিধার জন্য তাদের নাম দেওয়া হয়েছে।

কতকগুলি নক্ষত্রের নামে বাংলা মাসের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, দূর্বাষ্ঠারা, শ্রাবণ ইত্যাদি। চৈত্র—বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে কতকগুলি নক্ষত্র দেখা যায়, যাদের কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে একটা মানুষের চেহারা হয়। তার হাতে ধনুর্বাণ, কোমরে বেল্ট এবং তা থেকে একটা তরবারী ঝুলছে এই নক্ষত্রের নাম দেওয়া হয়েছে কালপুরুষ।

আবার সপ্তর্ষিমণ্ডলে আছে সাতটি নক্ষত্র। সাতজন প্রাচীন ঋষির নামানুসারে ঐ সাতটি নক্ষত্রের নামকরণ করা হয়েছে। চৈত্র-বৈশাখ মাস থেকে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত সন্ধ্যার সময় উত্তর আকাশে এদের দেখা যায়। এদের যদি একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করা যায় তাহলে এদের দেখায় একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রথম দুটিকে নক্ষত্রকে রেখা দিয়ে যোগ করলে উত্তর আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাকে বলে ধ্রুবতারা। এটি সারা বছরই আকাশে একই জায়গায় থাকে। এজন্যে এর দ্বারা প্রাচীনকালে নাবিকরা সমুদ্রের দিক নির্ণয় করত।

পূর্ব আকাশে ভোরবেলা জ্বল জ্বল করে ধ্রুবতারা, সন্ধ্যাবেলা পণ্ডিতরা পশ্চিম আকাশে ওকে সন্ধ্যাতারা রূপে দেখা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওটি নক্ষত্রের মত মিটমিট করে না। তাহলে ওটা কি?

ওটি আসলে আমাদের পৃথিবীর মত পাথর, বালি ইত্যাদি দিয়ে তৈরী, ওদের নিজের কোন আলো বা তেল নেই। তা হলে ওটা জ্বলজ্বল করে কেন? তার কারণ হলো, সূর্যের আলো এদের উপর ঠিকরে আসে, সে জন্য এরা জ্বলজ্বল করে। একটা আয়নায় যদি আলো ঠিকরে পড়ে তবে তা যেমন চকচক করে এও সেই রকম ব্যাপার। এদের বলা হয় গ্রহ। ধ্রুবতারা আসলে তাই শুক্রগ্রহ।

গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘোরে। মোট নয়টি গ্রহ আছে। তাদের নাম হল বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এদের মধ্যে বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে এবং প্লুটো সবচেয়ে দূরে। গ্রহগুলি সূর্যের টানে সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

যেমন আমরা অনেক সময় হাতের আঙ্গুলে সুতোয় ঢিল বেঁধে আমাদের চারদিকে বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে থাকি, অনেকটা সেই রকম ভাবেই সূর্যের টানে গ্রহগুলি সূর্যের চারপাশে ঘোরে। এক্ষেত্রে সুতোটা হল সূর্যের টান। গ্রহগুলি যে পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তা হলে অনেকটা ডিমের মত দেখতে। প্রতি গ্রহের চলার পথকে বলা হয় তার কক্ষপথ। গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল বুধ, এটি চেহারায় পৃথিবীর আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। আবার বৃহস্পতি হল গ্রহদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। এটি পৃথিবীর চেয়ে আকারে প্রায় নব্বই গুণ বড়। শুক্রগ্রহ আকারে পৃথিবীর প্রায় কাছাকাছি। সূর্য থেকে কাদের কি দূরত্ব তার হিসাব দেখা যাক—

বুধ	সূর্য থেকে	৬	কোটি কিলোমিটার দূরে,
শুক্র	সূর্য থেকে	১১	কোটি কিলোমিটার দূরে,
পৃথিবী	সূর্য থেকে	১৫	কোটি কিলোমিটার দূরে,
মঙ্গল	সূর্য থেকে	২৩	কোটি কিলোমিটার দূরে,
বৃহস্পতি	সূর্য থেকে	৭৮	কোটি কিলোমিটার দূরে,
শনি	সূর্য থেকে	১৪০	কোটি কিলোমিটার দূরে,
ইউরেনাস	সূর্য থেকে	২৯০	কোটি কিলোমিটার দূরে,
নেপচুন	সূর্য থেকে	৪৫০	কোটি কিলোমিটার দূরে,
প্লুটো	সূর্য থেকে	৫১০	কোটি কিলোমিটার দূরে,

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের মত সূর্যও চারদিকে ঘোরে।

রাতের আকাশে সব চেয়ে বড় এবং উজ্জ্বল যা দেখতে পাওয়া যায় তা হল চাঁদ। চাঁদও পৃথিবীর মত কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরী। তবে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তাই চাঁদকে গ্রহ না বলে উপগ্রহ বলা হয়। চাঁদও সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল হয়।

পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার সময় চাঁদের একটা দিক সব সময় পৃথিবীর দিকে থাকে, আর একদিক উল্টোমুখ করে থাকে।

পৃথিবীর চারদিকে পুরো একবার ঘুরতে চাঁদের একটা দিক সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে আর একদিকে উল্টোমুখ করে থাকে।

পৃথিবীর চারদিকে পুরো একপাক ঘুরতে চাঁদের সময় লাগে মোট ২৯½ দিন। সুন্দর মুখ হলে লোকে বলে চাঁদের মত মুখ। কিন্তু চাঁদের চেহারা মোটেও সুন্দর নয়। তাতে আছে অসংখ্য কালো কালো দাগ। বিজ্ঞানীরা দূরবীন দিয়ে দেখেছেন, ওগুলি হল পাহাড় আর গর্ত।

কিছুদিন হল আগে মানুষ মহাকাশযানে চড়ে চাঁদে গিয়েছে, সেখান থেকে নানারকম পাথর নিয়ে এসেছে।

চাঁদে বাতাস নেই

সেখানে কোন জীব নেই।

পৃথিবীর যেমন উপগ্রহে চাঁদ আছে, তেমনি অসংখ্য গ্রহেরও উপগ্রহ আছে। মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ, বৃহস্পতির এগারোটা উপগ্রহ।

চাঁদ যেমন পৃথিবীর স্বাভাবিক উপগ্রহ, তেমনি আবার বিজ্ঞানীদের তৈরী কতকগুলি উপগ্রহ আছে যেগুলি পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ।

১৯৫৭ সালে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী হয়। তারপর থেকে অনেক উপগ্রহ তৈরী হয়েছে। রাতে অনেক সময় কৃত্রিম উপগ্রহদের দেখা যায়। এদের দেখলে তারার মতই মনে হয়, কিন্তু এরা

সাধারণত এক জায়গায় স্থির থাকে না। বরং ধীরে ধীরে চলতে চলতে আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে চলে। চার কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু উপগ্রহগুলির নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

তারপর যখন দ্রুত নেমে আসে, তখন বায়ুর সাথে ধাক্কায় এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে পুড়ে যায়।

সূর্যের চারদিকে পুরো একপাক ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টার মত। এই সময়কে আমরা বলি এক বছর। সেই জন্যে পৃথিবীর একপাক ঘোরাকে বলা হয়—বার্ষিক গতি। সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ানর সময় পৃথিবী নিজে নিজে লাট্টুর মত পাক মারে। এভাবে ঘোরাকে বলা হয় আহ্নিক গতি। লাট্টুর মত পুরো একপাক ঘুরতে পৃথিবীর সময় লাগে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। এই সময়কে আমরা বলি একদিন। কিন্তু ঐভাবে ঘোরার সময় পৃথিবী তার কক্ষপথে সোজা থাকে না, বরং কিছুটা হেলে থাকে। আমাদের যেমন শিরদাঁড়া আছে তেমনই যদি ভেবে নিই পৃথিবীর একটা শিরদাঁড়া আছে তাহলে মনে হয় পৃথিবীর শিরদাঁড়া যেন সব সময় কক্ষপথে হেলে আছে। পৃথিবীর কক্ষপথে শিরদাঁড়া হেলে যাবার জন্য কখনও পৃথিবীর উত্তর ভাগ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে, কখনও বা দক্ষিণ ভাগ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে। যখন পৃথিবীর উত্তর ভাগ সূর্যের দিকে হেলে থাকে, তখন ঐখানে অনেকটা সোজা ভাবে কিরণ দেয়। ঐ সময় উত্তর ভাগ গরম বেশী লাগে, দিন বড় হয় রাত্রি ছোট হয়। আবার যখন ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর উত্তর ভাগ সূর্য থেকে পুবে চলে যায়, তখন সেখানে সূর্যের কিরণও হেলে পড়ে। তখন সেখানে গরম কমে যায়। দিন ছোট এবং রাত্রি বড় হয়।

সারা বছর ধরে সূর্যকিরণ কখনও সোজা, কখনও হেলে পৃথিবীর উপরে পড়ার জন্য দেখা দেয় নানা ঋতু। পৃথিবীর উত্তর ভাগে বা উত্তর গোলার্ধে যখন সূর্যকিরণ সোজা ভাবে পড়ে, তখন আমাদের দেশে খুব বেশী গরম পড়ে, তাকে আমরা বলি গ্রীষ্মকাল। সাধারণত এ সময়টা হয় মে ও জুন মাস। এর মধ্যে ২৩শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন হয় সবচেয়ে বড় আর ঐ তারিখের পর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধ আবার ধীরে ধীরে সূর্যের দিকে হেলতে থাকে এবং উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ২১শে অক্টোবর তারিখে পৃথিবী তার কক্ষপথে এমন ভাবে থাকে যে উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে দুটিই সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। ঐ তারিখে দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। আবার ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশী হেলে পড়ে। আর উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে আরও সরে যায়। গরম বেশ কমে যায়, তখন উত্তর গোলার্ধে হয় শীতকাল। এ ভাবে ২৩শে ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে সব থেকে দূরে থাকে, ফলে সেখানে সূর্যের কিরণ একেবারে হেলে পড়ে। ঐ তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট ও রাত্রি সবচেয়ে বড় হয়। উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস। তারপর থেকে আবার উত্তর গোলার্ধে সূর্যের দিকে ঘুরে পড়তে থাকে বলে সূর্যকিরণ একটু একটু করে সোজা ভাবে পড়তে থাকে। ২১শে মার্চ আবার দিন ও রাত্রি সমান হয়। একটা মজার বিষয় হল উত্তর গোলার্ধে যখন সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন হয় শীতকাল। আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। আর শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময় মার্চ ও এপ্রিল মাসে আবহাওয়া খুব আরামদায়ক। তখন শীতও বেশী নয়, গরমও বেশী নয়। তখন আমরা বলি শরৎকাল।

ঋতুগুলি যেমন বদলায়, তেমনি বদলায় মানুষের জীবন যাত্রা।

॥ সৌর পরিবারের কনিষ্ঠতম গ্রহ ॥

১৩ই মার্চ।

১৯৩০ সাল। আজ থেকে ৫৯ বছর আগের এক ঝলমলে সকাল। সেদিন ওই সময়ে সারা পৃথিবীর লোক জানতে পেরেছিল আমাদের এই পৃথিবীর এক সহোদরার কথা!

সৌর পরিবারের কনিষ্ঠতম গ্রহ প্লুটো ঠিক এমনি এক সকালেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবিষ্কারক এক তরুণ বিজ্ঞানী টমবাউ।

অবশ্য এই আবিষ্কার সেদিন সকালে হওয়ার অনেক আগেই প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পার্সিভ্যাল লাওলের নানা পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাব্য এই গ্রহের অনেক খবরই জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের।

আর সেইসব খবরের অধিকাংশই পরবর্তীকালে প্লুটো গ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সত্য ও অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

লাওয়েলের দুর্ভাগ্য যে তার জীবদ্দশায় এই গ্রহ আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। আর সেইজন্য তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য, এই কনিষ্ঠতম গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছিল PLUTO. যার প্রথম দুটি অক্ষর সেই চিরস্মরণীয় বিজ্ঞানীর নামের দুটি আদ্যক্ষর P. ও L.

কনিষ্ঠতম এই গ্রহটির সূর্য থেকে গড় দূরত্ব প্রায় ৩৬৭ কোটি মাইল এবং ব্যাস ৩৬০০ মাইল।

জ্যোতির্বিদ্যার মাপকাঠিতে এসব পঞ্চদশ শ্রেণীর। সূর্যকে একবার পুরো প্রদক্ষিণ করে আসতে এর সময় লাগে প্রায় ২৪৮ বছর। এর গাত্রবক্ষ এতই অমসৃণ যে এর গা থেকে সূর্যালোক মোটেই প্রতিফলিত হতে পারে না।

আর সেইজন্যই এই গ্রহটিকে এত অন্ধকার বলে মনে হয়। সূর্য থেকে এর ওই বিশাল দূরত্বের জন্য এর গাত্রদেশের তাপমাত্রা খুব

কম (−২৬৭° সেলসিয়াস)। তার ফলে প্লুটোতে কোন গ্যাসীয় বা তরল পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব।

পৃথিবীর তুলনায় এই গ্রহ ওজনে অনেক হাল্কা, পৃথিবীর ওজনের আশি শতাংশ।

যে কক্ষপথে প্লুটো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই কক্ষপথটি বেশ বৈচিত্র্যময়। কক্ষপথে ঘোরার সময়ে কখনো কখনো প্লুটো সহদরা নেপচুনের চেয়েও সূর্যের কাছে এসে পড়ে।

অবশ্য দুই সহদরার মধ্যে এর ফলে সংঘাতের কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ নেপচুনের কক্ষপথের সঙ্গে প্লুটোর কক্ষপথ প্রায় ১৭ ডিগ্রী মত কোণ করে থাকায় তাদের মধ্যে কখনোই সংঘর্ষ হতে পারে না।

প্লুটোর কক্ষপথের এই বৈচিত্র্য দেখে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা যে, প্লুটো কোন এক সময়ে হয়তো নেপচুনেরই উপগ্রহ ছিল।

প্লুটোর যা বয়স তার সম্বন্ধে জানার এখন অনেক বাকী। যদিও গত এক দশকে পৃথিবীর এই কনিষ্ঠা সহদরা সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য বিজ্ঞানীরা ধরে দিয়েছেন।

তবে অজানা তথ্য অনেক বেশী। বলা যেতে পারে সেজন্য যে গ্রীক পুরাণে বর্ণিত পাতাল পুরীর দেবতা প্লুটোর মত, এই গ্রহ আজও অতল পাতালের মত রহস্যময়।

তবুও ১৩ই মার্চ আমাদের এই কনিষ্ঠা সহদরাকে আমরা কেনই বা স্মরণ করি?

———

॥ ইউরেনাস আবিষ্কারের কথা ॥

ফরাসী বিজ্ঞানী লেমোনিয়ে ১৭৫০ থেকে ১৭৭৬ এই ২৬ বছর ধরে একটি গ্রহকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন।

মজার কথা আবার দুঃখের কথাও বটে—প্রবীণ বিজ্ঞানী তার ফলাফল কোথাও টুকে রাখলেন না।

এইখানেই তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এও লক্ষ্য করেছেন—আত্মভোলা বিজ্ঞানী লেমোনিয়ে কখনও কখনও গ্রহটির পর্যবেক্ষণের ফলাফল যা সত্যিই মূল্যবান, তা লিখে রাখলেন পাউডারের বাক্সের ওপর। প্রত্যেকে একই ধারণা করবেন যে—এটি নক্ষত্র।

যদিও সত্যি কবে একটি করে গ্রহ—পরে যাকে ইউরেনাস বলে জেনেছেন।

ইউরেনাস পৃথিবীর থেকে ৬৫ গুণ বড়। ইউরেনাস ৮৪ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

১৮৭১ সালে বিলাতের খুব নামকরা বিজ্ঞানী হাবেলি আর তার প্রিয় বোন ফেরেলিন দূরবীন চোখে তাকিয়ে, তাকিয়ে আছেন মহাকাশের অগণিত নক্ষত্রের দিকে।

ইচ্ছে সারা আকাশে যতো তারা আছে, তার একটু নকশা আঁকবেন।

হাবেলির নজরে ব্যাপারটা প্রথম আসে। একটা তারা কিছুক্ষণের মধ্যে তার স্থান পরিবর্তন করছে।

প্রথমে ব্যাপারটা অবাক করে হাবেলিকে। অনেক ভেবে চিন্তে

স্থির সিদ্ধান্তে আসেন এটা একটা গ্রহই। তখন ইংলণ্ডের রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন তৃতীয় জর্জ।

হাবেলি গ্রহটির নাম দিলেন 'জর্জ মিডেনিস গ্রহ'।

রাজা বিজ্ঞানী হাবেলিকে খুব ভালবাসতেন। যেহেতু হাবেলি এই গ্রহ আবিষ্কার করেছেন, তাই এর নাম হবে 'হাবেলি গ্রহ'।

হাবেলি নিজে এ ব্যাপারে আপত্তি করলেন।

গ্রীস দেশের পুরাণে আছে 'ইউরেনাস' নামটি।

শুনতে মন্দ লাগে না।

যদিও এই গ্রহ আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত বিজ্ঞানী লেমোনিয়েকেই পুরস্কৃত করা উচিত বলে অনেকে মনে করে।

প্রকৃত আবিষ্কারক হয়েও চিরকালই পর্দার আড়ালে রয়ে গেলেন বিজ্ঞানী লেমোনিয়া।

অবশ্য সবটাই নিজের দোষে।

———

॥ হ্রদের তলায় পাহাড় ॥

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অ্যাকাডমির সাইবেরি শাখার লিমোনলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর গভীরতম জলাশয়—বৈকাল হ্রদে কিছু কিছু কৌতূহলোদ্দীপক অনুসন্ধানকার্য চালিয়েছেন।

সেখানে পলি সঞ্চয়ের গতি অত্যন্ত দ্রুত। প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় পুষ্ট, এমনকি তিনগুণ বেশী। যখন নদীগুলি এই হ্রদে এনে ফেলে কোটি কোটি টন নুড়ী, পাথর, বালি আর কাদা আর বৈকাল হ্রদের আদি 'তলদেশের' অবস্থাটা কি ?

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে—কোন কোন জায়গায় আঠাল মাটি প্রায় ছয় কিলোমিটার পুরু জলের তলায় যে বিশাল বিশাল টেকটনিক শৈলশিরা হ্রদটিকে তিনটি বড় বড় শহরকে বিভক্ত করেছে। যেগুলি গোপন করেছে এই পলির তলায়।

হ্রদের তলায় রয়েছে প্রায় ৭ কিলোমিটার উঁচু এক পাহাড়।

॥ প্রাণীদের কুম্ভকর্ণ ॥

প্রাণিজগতে কুম্ভকর্ণের দলে রীতিমত প্রথমে নাম করতে হয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গভুক্ত বাদুড়দের। এরা বছরে প্রায় ছ' মাস কাটিয়ে দেয় শীত-ঘুমে। বাকী ছ' মাসও ঘুমোয় সারাদিন। সন্ধ্যের দিকে পোকা-মাকড়ের সন্ধানে ফেরে। তাও বড় জোর ঘণ্টাখানেক। তারপর যে যার আস্তানায় ঢুকে পড়ে, চলে যায় নিদ্রায়।...

ঘুম ভাঙতে ভাঙতে এসে পড়ে শেষরাত। সূর্য ওঠার আবছা আলোয় দেখে নেয় ওরা পোকা-মাকড়। এবারেও সময় দেয় ঘণ্টাখানেক। ডানায় ভর দিয়ে এরা ওড়ে বছরে ৬০০ ঘণ্টারও কম। এবং এই ঘোরাঘুরি তাদের আয়ুষ্কালের মান শতাংশ।

ইউরোপের কাঠবেড়ালি জাতের ক্ষুদে ইঁদুরগুলো ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘুমিয়ে কাটায় বছরে ছয়মাস। যদিও ছয় মাস ঘুমোয় দিনভর। আর রাতের দিকে যে পোকা-মাকড়ের সন্ধানে ঘুরঘুর করে, তাও একরাশ ঘুম নিয়ে চোখে। এদের আয়ুষ্কালের মতই ১২ থেকে ১৩ শতাংশ সময় কাটে জাগ্রত অবস্থায়।

নিউজিল্যাণ্ডের আদিম টিকটিকি জাতীয় প্রাণী তুয়াতারারাও প্যানা শীতঘুমে কাটায় বছরের অর্ধেক সময়।

বাকি সময়টা লুকিয়ে থাকে ঝোপ-ঝাড়ের আস্তানায়। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে রোদ পোহাতে। এদের পারত্রিক ক্রিয়া এতই ধীরগতি যে খাদ্যের চাহিদা নেই বললেই চলে। এদের হাড় বৃদ্ধি এতই কম যে বিশ বছর বয়সের আগে স্ত্রী তুয়াতারারাও ডিম পাড়ে

না। এদের আয়ুষ্কাল নাকি ১০০ থেকে ৩০০ বছর। তবে ১০ শতাংশ সময়ই কেটে যায় নিদ্রা-তন্দ্রার ঘোরে।

আলাস্কার উত্তরপ্রদেশে বেলাভূমির কাঠবেড়ালিরা বছরে নয় মাসই ঘুম দেয় মড়ার মতো। বাকি তিন মাস থাকে সদা ব্যস্ত—খায়-দায়—খাদ্য মজুত করে আস্তানায়, বাচ্চাদের জন্ম দেয়, পালন করে। এভাবে কেটে যায় দিনের সতের ঘণ্টা। এবং আয়ুষ্কালের ১০ শতাংশ থাকে জাগ্রত অবস্থায়।......

———

॥ কীটপতঙ্গের আত্মরক্ষার কৌশল ॥

মানুষ শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে নানান কৌশল জানে।

নিত্য নতুন কৌশল বের করে মানুষ শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ বেছে নিয়েছে নানান যন্ত্র··· আগ্নেয়াস্ত্র। কেউ শেখে জুডো—ক্যারাটে। কেউ আবার নিয়মিত শরীর চর্চা করে। এ ছাড়া মানুষের উন্নত বুদ্ধিই তার আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

প্রাণিকুলে পশুপাখি ও নানান কীটপতঙ্গ আত্মরক্ষার তাগিদে নানান পন্থা অবলম্বন করে। সে সব যেমন বিচিত্র তেমনি মজার।

প্রাণিকুলের প্রাণীরা ছদ্মবেশ ধারণ করে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে। আবার ছদ্মবেশে শিকার ধরতেও সুবিধা হয়।

কিছু প্রাণী আছে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের গায়ের রঙ বদলায়।

শত্রুর আক্রমণ রক্ষা করার জন্যই পরিবেশের রঙ অনুযায়ী লাল, নীল, হলুদ বা সবুজ বর্ণে নিজেদের সাজিয়ে নেয়।

মাছেদের এই ভাবে রঙ পরিবর্তন করার ক্ষমতা সব থেকে বেশি। সমুদ্রে এক বিশেষ প্রজাপতির নীল চিংড়ি মাছ আছে যারা সবুজ সবুজ শ্যাওয়ালার মধ্যে সবুজ বর্ণ ধারণ করে। আবার জলে গেলে মেটে রঙ ধারণ করে। পরে এই চিংড়ির গায়ের রঙ পিঙ্গল বর্ণের হয়।

পতঙ্গরাও ছদ্মবেশ ধারণ করে। এরা যে পরিবেশে বাস করে কোন বস্তুর আকার ধারণ করে। ফলে এই পতঙ্গেরা গাছের পাতা বা

ছোট ডালপালার আকার ধারণ করে। এক জাতের মস দিনের বেলায় এমন ভাবে বাস করে যে দেখলেই মনে হবে যে, পাতাহীন একটা বোঁটা গাছের ডালের গায়ে আটকে আছে।

কিছু প্রাণীকে আত্মরক্ষা করতে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় না। ভগবান এদের দেহ এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন তা তাদের আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট।

সজারুর দেহের কথা ভাবুন। এদের দেহময় কাঁটা। শত্রু আক্রমণ করলে দেহটা ফুলিয়ে নেয়।

বলের মত অনেকটা দেখতে হয়। ঠিক যেন একটা কাঠের গোলা। শত্রু এদের তখন আক্রমণ করতে ভয় পায়। করাত মাছ। এদের মাথায় করাতের মত দাঁত বাঁধাই, আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট।

গাদি পোকা, গন্ধ গোকুল প্রভৃতি পতঙ্গরা শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে দেহ থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়ায়। ফলে শত্রু তার কাছে আসতে পারে না।

কিছু প্রাণীর আত্মরক্ষার ধারণা অনেকটা রক্ষণাত্মক। বিশেষ করে যাদের হুল আছে। বোলতার কথাই ধরা যাক। বোলতার চাকে ঢিল ছুঁড়তে ভয় পাই। বোলতার দেহে হলদে কালো ডোরা কাটা। এদের দেহের এই রঙই অন্য প্রাণীদের সতর্ক করে দেয়। তাই এদের পাখী বা অন্য প্রাণী ভুলেও ছোঁয় না। ছুলেও বিপদ।

আফ্রিকার এক ধরনের প্রজাপতির গায়ের রঙ ময়লা আর কালোর উপর সাদা ছিটে। ঝক ঝকে রঙ।

সহজেই এদের চোখে পড়ে…।

অথচ এরা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করে। কোন ভয়-ডর নেই। এদের শরীরে এক ধরনের বিষ আছে। যা পাখির পেটে গেলে বমি শুরু হয়। তাই পাখীরা এদের এড়িয়ে চলে।

আবার বিষহীন হুবহু প্রজাপতির মত দেখতে আর এক ধরনের প্রজাপতি আছে।

পাখিরা এদের বিষাক্ত প্রজাপতি ভেবে ভুল করে খায় না। তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজাপতি বেঁচে যায় শুধু চেহারার জোরে।

॥ তাপের প্রবাহ ও মেঘের উৎপত্তি ॥

বাড়িতে জ্বলন্ত উনানে হাঁড়ি কড়া বা অন্য কোন পাত্র যখন বসান থাকে তখন হাত দিয়ে ছুলে কি মনে হয় ? ওটা এত গরম হয়ে যায় যে, কেউ হাত দিয়ে তা ধরতেই পারবে না।

দুপুরে রৌদ্রে উঠানে ইট, পাথর বা কিছু পড়ে থাকলে তা গরমে যেন তেতে থাকে। পৌষ, মাঘ মাসের রাতে যখন খুব ঠাণ্ডা পড়ে তখন গ্রামাঞ্চলে অনেকে কাঠ কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করে। তাপ পেলে সব জিনিসই গরম হয়।

কিন্তু তাপ পেলেও সব জিনিস সমান ভাবে গরম হয় না। কেটলির জল যখন গরম করা হয়, তখন কেটলিটা হাত দিয়ে ছুঁলে গরম লাগে বটে, কিন্তু ওর হাতলটা যদি বেত দিয়ে মোড়া থাকে, তাহলে সেই হাতলটা সহজেই ধরা যায়।

রৌদ্রে একটুকরো কাঠ আর একটুকরো লোহা ফেলে রাখলে কিছুক্ষণ পর দেখা যায় লোহাটা কাঠের চেয়ে বেশী গরম লাগছে। তাপ পেলে এক এক জিনিস এক এক রকম ভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের আশেপাশে যে সব জিনিস দেখি সেগুলি সব সমান গরম ও ঠাণ্ডা নয়। কুঁয়োর জল ঠাণ্ডা বটে, কিন্তু বরফ তার চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা। আবার গরম চা বা গরম দুধ যতটা গরম উনানের গনগনে আঁচ তার থেকে অনেক বেশী গরম।

তাপ পেলে সব জিনিসই যেমন কিছু না কিছু গরম হয়, তেমনিই তাদের মধ্যে আবার নানারকম পরিবর্তনও দেখা যায়। তাপে বস্তুর

আয়তন বেড়ে যায়। গরুর গাড়ির চাকায় কি ভাবে লোহার বেড় লাগানো হয়?

প্রথমে লোহার বেড়টা চাকার থেকে সামান্য ছোট মাপে তৈরী করা হয়। তখন ওটা চাকার গায়ে লাগানো যায় না। তারপর ঐ বেড়টাকে আগুনে জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গরম করা হয়। তার ফলে বেড়টা আয়তনে অনেক বড় হয়। তখন ঐ গরম বেড়টা চিমটে দিয়ে ধরে চাকার গায়ে লাগানো হয়। আবার ঠাণ্ডা হলে ওটা যেই ছোট হয়ে যায় তখন ওটা চাকার গায়ে কামড়ে ধরে। রেল লাইন ধরে কেউ যদি হেঁটে যায় তা হলে সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবে, রেল লাইনের জোড়ার মধ্যে ফাঁক থাকে। তার কারণ হল, গরমে রেল লাইনটা বেড়ে ঐ ফাঁক বুজে যায়। ঐ রকম ফাঁক না থাকলে লাইন দুটো উঠে যাবে। এইজন্য ঐ ফাঁকের ব্যবস্থা।

গরমে শুধু যে কঠিন পদার্থই যে আয়তনে বাড়ে তা নয়, দুধ, জল প্রভৃতি তরল পদার্থগুলিও আয়তনে বাড়ে। আর গরম হলে বায়ু প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থগুলি আয়তনে অনেক বেড়ে যায়।

তাপ পেলে পদার্থের রূপও পরিবর্তন হতে পারে। মোমবাতিটা যখন জ্বলতে থাকে তখন গরম হয়ে ওর গা বেয়ে তরল মোম গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। বরফটা শক্ত জিনিস, কিন্তু ঘরের গরমে তা গলে জল হয়ে যায়। আবার জলকে যদি গরম করা যায়, তা থেকে জলীয় বাষ্প বের হয়। কিন্তু বরফ জল আর জলীয় বাষ্প আসলে একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সব জিনিস আবার সহজে গলে না। লোহাকে প্রচণ্ড উত্তাপ দিলে তবে তা গলে যায়।

লোহাকে যখন কামারশালায় গরম করা হয় তখন তাকে দেখতে কি রকম লাগে? লোহা গরম হলে প্রথমে লাল হয়। পরে তা এত

উজ্জ্বল সাদা হয়ে যায় যে, তা থেকে আলো বের হয়। বিজলীবাতির বাল্বের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তারের কুণ্ডলী আছে তা বিদ্যুৎ চলার জন্য খুব গরম হয়ে গিয়ে আলো দেয়।

শুধু 'ঠাণ্ডা' বা 'গরম' এ কথা বললে বোঝায় যে কোন্ জিনিস কতটা ঠাণ্ডা বা কতটা গরম? যেমন ধরা যাক্, কোন শ্রেণীতে তিরিশটি ছেলে আছে। শুধু যদি বলি..'রাজা লম্বা' বা 'অরুণ লম্বা'। তা হলে কি বোঝা যাবে কে কতটা লম্বা? কিন্তু যদি কোন মিটারের স্কেল নিয়ে মেপে বলা যায় কে কত মিটার কত সেন্টিমিটার লম্বা, তাহলে সঠিকভাবে বুঝতে পারা যাবে, কে কতটা লম্বা বা একজন আরেকজন থেকে কতটা লম্বা।

ঠিক তেমনই কোন জিনিস কতটা গরম তা মাপবার জন্য স্কেল আছে। এই স্কেল কোথা থেকে দেখা যায়? যেমন জ্বর দেখতে হলে থার্মোমিটার নামে যে জিনিসটি ব্যবহার করা হয় তা তো আমরা দেখেছি। তার গায়েই ঐ স্কেল আছে।

একটা থার্মোমিটার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার গায়ে অনেক দাগ কাটা আছে। ঐ দাগগুলি হল 'গরম তাপ' মাপার স্কেল। জ্বর হলে শরীর কতটা গরম হয়েছে তা জানার জন্য বগলে বা মুখে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

তার কিছুক্ষণ পর থার্মোমিটার বের করে আনা হয়। কিন্তু মুখের বা বগলের গরমে থার্মোমিটারের মধ্যে কি হয়?

থার্মোমিটারকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার কাঁচের নলের মধ্যে সরু একটা চক্‌চকে সূতোর মত জিনিস রয়েছে। ওটা কি? ওটা হল একটা ধাতু, ওর নাম পারদ।

পারদ কিন্তু এমনিতেই তরল থাকে। শরীরের গরমে পারদটাও

গরম হয় এবং আয়তনে বাড়তে থাকে। যতই ওটা আয়তনে বাড়ে, ততই থার্মোমিটারের ভেতর একটা ফাঁপা নল আছে তার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই ভাবে কতদূর অবধি পারদ ছড়িয়ে পড়ল তা বোঝা যাবে থার্মোমিটারের গায়ের মাপগুলির সাহায্যে। যে দাগের কাছে পারদের সূতাটি থাকবে তা দেখে পারদের এই আয়তন বৃদ্ধির পরিমাণ বুঝতে পারবে।

থার্মোমিটারের স্কেল নানা রকমের হয়, যেমন হয় দৈর্ঘ্য মাপার ফুট-মিটার প্রভৃতি স্কেল।

সাধারণত বেশীর ভাগ থার্মোমিটারে যে স্কেল থাকে তাকে বলা হয় সেন্টিগ্রেড স্কেল। এ ছাড়া আরও ফারেনহাইট স্কেল ও অন্যান্য স্কেল আছে।

জ্বর মাপার জন্য যে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার ব্যবহার হয় তাতে কিন্তু সম্পূর্ণ স্কেলটি থাকে না। একটি পুরো সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার নিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ০ থেকে ১০০ পর্যন্ত দাগ কাটা আছে। প্রত্যেকটা দাগকে বলে এক ডিগ্রী।

যদি একটা পাত্রে কিছু বরফ রেখে সেখানে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারটি দাঁড় করিয়ে রাখা হয় তবে তার মধ্যে পারদের সূতাটি ০° ঘরের কাছে গিয়ে স্থির থাকবে।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে জলকে ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ঠাণ্ডা করা হলে তা জমে বরফ হবে। আবার জলকে কেটলি করে ফুটতে দিয়ে জলের বাষ্পের মধ্যে থার্মোমিটারকে ধরে রাখলে পারদ গিয়ে ১০০ ঘরের মধ্যে ঠেকেছে। সুতরাং জল ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত গরম হলে তবেই তা ফুটতে থাকবে।

জল ফুটে বাষ্প হতে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাকে গরম

করতে হয়, কিন্তু জল সামান্য গরম হলেও তা থেকে বাষ্প বের হতে পারে, যদিও তা ফোটে না।...আবার লেখার শ্লেট ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দিলেও কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরেই তা শুকিয়ে যায়। তার কারণ সূর্যের তাপে ভিজে কাপড়ের জল অল্প গরমেই বাষ্প হয়ে যেতে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—পুকুর, নদী, খাল প্রভৃতির জল গরমকালে কত কমে যায়। তার কারণ সূর্যতাপে সব সময়ই কিছু পরিমাণ জল বাষ্পে পরিণত হয়। জোর হাওয়া বইলে ভিজে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়, বাদলা দিনের থেকে শুকনো দিনে কাপড় শুকোয় তাড়াতাড়ি।

জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়। সেখানে গিয়ে জলীয় বাষ্প-এর ঠাণ্ডা পেয়ে মেঘে পরিণত হয়। মেঘে অবশ্য জলীয় বাষ্প ছাড়াও রয়েছে যত রাজ্যের ধূলিকণা।

ধূলিকণা ছাড়া মেঘ জমাট বাধে না। মেঘ যখন কোন কারণে খুব ঠাণ্ডা হয় তখন সে-ই আবার জল হয়ে যায়।

কেটলিতে জল ফোটালে যে বাষ্প বের হয় তার ওপরে একটা ঠাণ্ডা থালা রাখলে দেখা যাবে তার নীচে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে। একটি বাটিতে বা গ্লাসে কিছুটা বরফ রাখলে দেখা যাবে, বাটি বা গ্লাসটির গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা জমেছে। এর কারণ, বরফের সংস্পর্শে গ্লাস বা বাটি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঐ ঠাণ্ডা বাটির সংস্পর্শে এসে বাতাসের মধ্যে যে জলীয় বাষ্প আছে তা জলকণায় পরিণত হয়েছে।

শীতের সময় মাঝে মাঝে ঘন কুয়াশায় চারদিকে ঢেকে যায়। এই কুয়াশা জলীয় বাষ্পের আস্তরণ। শীতকালে ভোরে উঠলে দেখতে পাওয়া যায় ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুগুলি চক্‌চক্‌ করছে।

ওগুলি এল কোথা থেকে ?

শীতের রাত্রে যখন মাটি খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাতে জলীয় বাষ্প জমে জল হয় ।

তাই বৃষ্টি নেমে আসে। বৃষ্টির জল মাটি, পুকুর, নদী, সাগরে পড়ে। মাটি এই জল কিছুটা শুষে নেয়। বাকি জল গড়িয়ে পুকুর, নদী, নালা প্রভৃতিতে পড়ে। সেই জল আবার ক্রমশ গরম হয়ে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে।

ঐ বাষ্প ওপর আকাশে গিয়ে হয় মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।

এই ভাবেই জল থেকে মেঘ, মেঘ থেকে জল—

এই পরিবর্তন চক্রাকারে অবিরাম চলেছে।

॥ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে শক্তির উৎস ॥

আমরা নিজেরা খুব বেশী কাজ করতে পারি না। এমনকি খুব শক্তিশালী মানুষও যতটা কাজ করে তার একটা সীমা আছে। সেইজন্য মানুষ অতীত কাল থেকেই চিন্তা করেছে কি ভাবে বায়ু জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে কাজ করা যায়।

বায়ুপ্রবাহ বা জলের স্রোত এইসব প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী।

বায়ু যখন প্রচণ্ড বেগে বয়ে যায় তখন কত ঘরবাড়ী ভেঙে যায়। গাছপালা পড়ে যায়। কত কি উড়ে যায়।

কিন্তু এই বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে পালতোলা নৌকা কেমন তরতর করে যায়। আবার চাকার সাহায্যে বায়ুর শক্তিতে আরও অনেক কাজ করা যায়। বায়ুকলের সাহায্যে ইঁদারা থেকে জল তোলা, গম পেষাই করা প্রভৃতি কাজ সহজে হয়।

জলস্রোতও একটি প্রাকৃতিক শক্তির উৎস। বন্যার সময় জল-স্রোতের প্রচণ্ড শক্তিতে বহু কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আবার ঐ জল-স্রোতের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে অনেক রকম কাজ করা যায়। নদীর জলকে, পাহাড়ের কোলে কোন জায়গায় কৃত্রিমভাবে ধরে রাখা যায় তাকে বলা হয় বাঁধ। সেখান থেকে ঐ জলকে যখন ছাড়া হয় তখন তা প্রচণ্ড শক্তিতে নেমে আসে। ঐ শক্তির সাহায্যে প্রচণ্ড বেগে চাকা ঘুরিয়ে নানা কাজ করা যায়। এই চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

নদীর জল বা সাগরের জল বিশেষ সময় ফুলে ফেঁপে ওঠে, আবার

কখনও কখনও তা অনেক নেমে যায়। একে বলা হয় জোয়ার-ভাঁটা'। জোয়ার-ভাঁটার সময় সাগর বা নদীর জলের স্রোতে প্রচণ্ড শক্তি থাকে তাকে দিয়েও কাজ করা যায়।

বায়ুপ্রবাহ বা জলস্রোতের শক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য নানা ধরনের শক্তির সাহায্য নিতে হয়। তার একটি হল তাপশক্তি। তাপশক্তির সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। উনানে কাঠ বা কয়লা ইত্যাদি জ্বালালে তা কি রকম গরম হয়ে ওঠে তা সবাই দেখেছি।

এর মধ্যে যে শক্তি থাকে তাকে বলা হয় তাপশক্তি।

কয়লা, কেরাসিন, কাঠ, পেট্রোল, মোম প্রভৃতি জিনিস পোড়ালে তাপশক্তি পাওয়া যায়। এই তাপশক্তির সাহায্যে যেমন রান্না করা যায় আবার অন্যান্য কঠিন কাজ করা যায়। ছুরি, কাঁচি দা প্রভৃতি জিনিস আমাদের নানা কাজে লাগে। এগুলি লোহা দিয়ে তৈরী। এছাড়া আরও অনেক যন্ত্রপাতি আছে যেগুলি লোহা বা লোহার মত শক্ত কোন ধাতু দিয়ে তৈরী। ঐ সব যন্ত্রপাতি তৈরী করতে গেলে ধাতুকে আগে গলিয়ে নেওয়া দরকার। তার জন্য দরকার হয় তাপশক্তির।

আমরা যে নানারকম কাজ করি তার জন্য শক্তি দরকার হয়। সে শক্তি আসে আমাদের শরীর থেকে। আমরা নানারকম খাবার খাই, সে সব খাবার শরীরের মধ্যে শ্বাসকার্যের সময় পুড়ে গিয়ে তাপ সৃষ্টি করে। আবার এই তাপ আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। সূর্য একটি প্রচণ্ড তাপশক্তির উৎস।

তাপের সাহায্যে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরী হয়। উনানে কেটলিতে যখন জল ফোটে তখন কেটলির মুখ থেকে বাষ্প বের হতে থাকে।

এই বাষ্পেরও প্রচণ্ড শক্তি আছে। বাষ্পশক্তির সাহায্যে নানা রকমের কাজ হয়। যে ষ্টীম ইঞ্জিন রেলগাড়ি টানে তা বাষ্পশক্তির সাহায্যে চলে। আর এক ধরনের শক্তির সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। তা হল বৈদ্যুতিক শক্তি। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা বাতি জ্বলে। এই বাতি কেরাসিনের বাতি বা মোমবাতি থেকে আলাদা। বিদ্যুতের তারের খুঁটি অনেক সময় চোখে পড়ে। বিদ্যুৎ এই তারের মধ্য দিয়ে আসে।

বাল্বের মধ্যে খুব সরু সরু তার আছে। ঐ তারের মধ্যে যখন বিদ্যুৎ যায়, তখন তা খুব গরম হয়ে ওঠে এবং সাদা হয়ে আলো দেয়।

বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে পাখা ঘোরে, নানা কলকারখানা চলে।

বৈদ্যুতিক শক্তিতে ট্রেন চলে। আরও কত রকমের কাজে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

॥ মহাকাশের সন্ধানে ॥

গ্যালিলিও যে দিন তাঁর টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন, সেদিন যে উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল, আমরা তাও অনুমানে উপলব্ধি করতে পারি।

ঠিক তেমনি ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে সেই রকমই বিপুল আলোড়ন দেখা গেল ; সারা পৃথিবীর লোক আমরা সবিস্ময়ে জানলাম এক আশ্চর্য কাহিনী।

শুনলাম যে সোভিয়েট রাশিয়া একটি নতুন চাঁদ বানিয়েছে মহাকাশে। পৃথিবী থেকে ৫৬০ মাইল ওপরে একটি শিশু চাঁদ পুঁতে দিয়েছেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের যে কাজ এই শিশুটি তাই করে চলেছে। প্রতি ছিয়ানব্বই মিনিটে এই ছোট চাঁদটি তার সাড়ে তিরাশী কিলোগ্রামের বপুটি নিয়ে হিপ হিপ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

এই অসাধ্য সাধন করেছেন যে বিজ্ঞানীরা, তাঁরা তাঁদের ভাষায় এই শিশু চাঁদটির নাম দিয়েছেন 'স্পুৎনিক'।

মহাকাশকে নিয়ে অনেক গাল-গল্প যুগ যুগ ধরে শোনা গেছে। শোনা গেছে, অনেক পৌরাণিক কাহিনী। আমাদের কল্পনা সেখানে হয়েছে অবারিত।

কিন্তু ঐ কল্পনা যে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সাধনায় সত্যে পরিণত হবে, তা পৃথিবীর কোন মানুষই ভাবতে পারেনি। তাই ঐ ৪ঠা অক্টোবর তারিখটি সকলের মনে কী বিস্ময় যে বহন করে এনেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যায় না।

তবে এই বিস্ময়কর ঘটনাটি কিন্তু একদিনে আসেনি। আনরা সামনে যে সাফল্য দেখলাম, তার পেছনে যে কী দুস্তর সাধনা ছিল, তার যদি হিসাব নেওয়া যায় তবে বিস্ময় আরো বাড়ে।

আর প্রকৃতির যে বাধা, সে বাধাও কি কম ?

এ সব তথ্য কি একদিনে সংগৃহীত হয়েছে ? না এর জন্যও সময় লেগেছে অনেক।

কেটেছে বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ।

ঈশ্বর পৃথিবীর সীমানার ভেতর রাখতে চেয়েছিলেন মানুষকে।

এখন মানুষ যদি সেই বিধান চূর্ণ করতে এগিয়ে আসে, তবে তাকে তার জন্য খরচ করতে হবে অনেক বুদ্ধি : করতে হবে অনেক শ্রম। অনেক ঘাম। হলও তাই।

সেই সুদূর সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটন যেদিন বাগানের গাছতলায় বসে একটি আপেলকে মাটিতে পড়তে দেখেছিলেন, সেদিন থেকেই এ সাধনার শুরু বলা যায়।

আইজাক নিউটন সেদিন বুঝেছিলেন, পৃথিবী সব জিনিসকেই টানছে তার কেন্দ্রের দিকে। তাই পৃথিবীর আকর্ষণে আপেল পড়ে মাটিতে। কেবল আপেলই বা বলি কেন, স্বয়ং চাঁদও এই টানে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। আর সূর্যের এইরকম টান আছে বলে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলো আজও সৌর পরিবারের একজন।

শুধু কি এই কেন্দ্রের দিকে টান ?

কেন্দ্র থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার টানও এদের কম নয়।

সুযোগ পেলেই চাঁদ ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় পৃথিবী থেকে।

পৃথিবী অনুরূপ ভাবে সূর্যের বাঁধন ছিঁড়তে পারলে বাঁচে।

এইভাবে পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণের ভেতর দিয়ে সৌর পরিবারের গ্রহ-উপগ্রহগুলো তাদের ঘর সংসার করে চলেছে।

বলা বাহুল্য এইসব বিশ্ববিধান জানতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে। অনেক। আবার এরই ফাঁকে যন্ত্র বানিয়ে এবং তা চালিয়ে কেমন করে বিশ্ববিধান ফাঁকি দেওয়া যায় তার ষড়যন্ত্র করছে মানুষ।

এঁরা হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন যে, কোন ব্যোমযানের বেগ যদি ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল ধরা যায়, তাহলে পৃথিবীর মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়ে কবে সেই যানকে পাঠানো যায় গ্রহে গ্রহান্তরে।

আর কোন যানকে একবার পনের হাজার আটাশ মাইল গতি দিতে পারলে তাকে কৃত্রিম চাঁদে পরিণত করা যাবে অনায়াসেই।

বিজ্ঞানীরা কেবল এসব অংক কষেই ছেড়ে দিলেন না।

তাঁরা সম্ভাব্য মহাকাশ যানের ছবি পেলেন।

এ যান আকারে প্রকারে হল অবিকল হাউয়ের মতন।

মার্কোপোলো চীনদেশে গিয়ে হাউই-এর মেলা নিশ্চয় দেখে-ছিলেন। দেখলে আমাদের আধুনিক মহাকাশ যানকে চাক্ষুষ করে নিতেন।

আমাদের মহাকাশ যানটির নাম হল রকেট। এর মুখটি ভোতা। ভেতরে ভরা আছে তরল অক্সিজেন। এই জ্বালানীতে আগুন লাগলেই রকেট তীব্র বেগে ওপরে উঠতে থাকে।

আর এই বেগ সঞ্চারিত হয় ধাক্কা খেয়ে।

কম্প্যালতিন নামে একজন রুশ বিজ্ঞানী সারা জীবন এইসব নিয়ে ভেবেছেন।

সারা জীবন গবেষণা করেছিলেন তিনি আন্তগ্র্হ যাতায়াতের সম্ভাবনা নিয়ে।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে 'রকেটের' একটি নক্সা এবং অনেক হিসাবও তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

মার্কিন বিজ্ঞানী গর্গও-এর দান এ ব্যাপারে কম নয়।

১৯২৬ সালে তিনিই জানিয়েছিলেন যে তরল জ্বালানী ছাড়া এই মহাকাশ যান পাড়ি দেবে না গ্রহ-গ্রহান্তরে।

যাই হোক শেষবেশ এই বহু সাধনের সাধনার দ্বারা মিলে এক হল ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ, ৪ঠা অক্টোবর। তাই আমাদের মানবেতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন।

এর পরে এক এক করে বহু নাটকীয় ঘটনাই ঘটে যেতে লাগল। প্রতিটি ঘটনা রীতিমত চমকপ্রদ রীতিমত বিস্ময়কর।

চাঁদে যাওয়ার পরেই তবে একটু বিরতি ঘটল।

৪ঠা অক্টোবর প্রথম 'স্পুৎনিক' মহাকাশে যাওয়ার ঠিক একমাস পরেই সোভিয়েত রাশিয়া ছেড়ে ছিল দ্বিতীয় 'স্পুৎনিক'। প্রথমটির থেকে এটি ওজনে প্রায় ছয়গুণ ভারি এবং এর ভেতরে একটি কুকুর ঢোকানো হল। কুকুরটির নাম লাইকা। তবে মহাকাশের এই প্রথম যাত্রীটি দেহ রাখল ঐ মহাকাশেই। তাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না।

এদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশ যাত্রার সাফল্যে আমেরিকায় পিছিয়ে থাকতে পারল না।

ছয় মাস গড়াতে দিল না। ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী 'জুপিটার-সি' নামে একটি রকেটকে সে ছুঁড়ে দিল মহাকাশে। এরই সাহায্যে এক্সপ্লোরার-১ নামে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপিত হল।

এইভাবে মহাকাশ অভিযানের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র।

এদের প্রত্যেকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিত্য নূতন তথ্য এসে হাজির হতে থাকল এবং আমরা চমকে উঠতে থাকলাম অসম্ভব সব ক্রিয়াকলাপে।...

মানুষ যা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তা দেখা দিল অতিশয় বাস্তব হয়ে।

১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী রাশিয়ার প্রথম 'লুনিক' চাঁদের খবর সংগ্রহে বেড়িয়ে পড়ল।

তবে এটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শেষমেশ একটি গ্রহ হয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে লাগল।

কয়েক মাস বাদে ১৩ই সেপ্টেম্বর যাত্রা করল দ্বিতীয় লুনিক।

সোজা গিয়ে এটি হাজির হল চাঁদে। সময় নিল চৌত্রিশ ঘণ্টা। এরপর গেল একটি তৃতীয় 'লুনিক'। চাঁদের বিপরীত দিকটা আমরা আর দেখিনি, এদিকের ছবি সে পাঠাতে থাকল।

এরই মধ্যে দেখতে দেখতে গড়িয়ে গেল একটি বছর। বসন্ত তার ফুলের সম্ভার নিয়ে চলে গেল, গ্রীষ্ম গেল তার প্রচণ্ড দাবাদহ নিয়ে। এলো বর্ষা। সেই বর্ষাও যখন যাই যাই করছে সেই সময়ে ১৯শে আগস্ট তারিখে 'স্ত্রেনকা' 'বেনিক' নামে দুটি কুকুরকে উপগ্রহের ভেতর করে রাশিয়া পাঠিয়ে দিল মহাকাশে। মজার কথা, সেই কুকুর দুটিকে ফিরিয়ে আনা হল যথাসময়ে। সকলে তাজ্জব বনে গেল।

কিন্তু কে জানত এর থেকেও তাজ্জব ঘটনা অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য !

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে এ ঘটনা ঘটল। 'ভোস্তক' নামে একটি মহাকাশ যানে চেপে ১০৮ মিনিটের জন্য মহাশূন্যে ঘুরে এলেন ইউরি গ্যাগারিন। সোভিয়েট রাশিয়ার এই অপূর্ব কৃতিত্বে সকলে অবাক। শুধু অবাক নয় হতবাক।

এদিকে আমেরিকাও পিছিয়ে থাকল না। ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আকাশে বেড়িয়ে এলেন 'অ্যালেন শেপার্ড'। এইভাবে দেখতে দেখতে এই মহাশূন্যে ঘুরে এলেন অনেকেই। ঘুরে এলেন টিউড, জনগ্রেস। ডালেনতিনা তেরেস্কাভা' নামে এক মহিলাও মহাকাশে ঘুরে এলেন।

আশ্চর্য বিজ্ঞানের কলাকৌশল। শূন্যপথ অতিক্রম করে সুতীব্র-বেগে নির্দিষ্ট গতিপথে সত্যিই মহাকাশ যান চাঁদের দেশের আওতায় পৌঁছে গেল। এবার মূল মহাকাশ যানের চালক কলিন্স রইলেন মূলযানে এবং আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন 'ইগল' নামে আরেকটি যানে উঠে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করতে লাগলেন। এই 'ইগল' হল চাঁদের দেশে নামবার ভেলা। সত্যিই অসাধ্য সাধন হল। 'ইগল' চাঁদের মাটি স্পর্শ করল। ভেলা থেকে চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন আর্মষ্ট্রং। এই দিনটিই ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই। মর্ত্য মানবের চন্দ্র অবতরণের অমর ও স্মরণীয় দিন।

তার কিছুদিন পরে চাঁদের মাটিতে নামলেন অলড্রিন। দুজনে মিলে চাঁদের ধূলো সংগ্রহ করলেন। পাথর, নুড়ি সংগ্রহ করলেন। চাঁদের দেশের নানা ছবি তুললেন। এবং চাঁদের মাটিতে স্থাপন করলেন মানুষের চন্দ্রজয়ের স্মৃতিফলক।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা চাঁদে নেমে আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন আবার ঈগলে উঠে মূল মহাকাশ যানের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর বিপদের ঝুঁকি অল্প ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান কোন বাধাকেই বাধা মনে করে না। বাধা কেটে চলাই বিজ্ঞানের কাজ। যান্ত্রিক নিয়মে 'ঈগল' যথাবিধি মূল মহাকাশ যানের সঙ্গে মিলিত হল। কিছু পরে ঈগলকে পুরে নিয়ে মূলযান ফিরতে লাগল আকাশের দিকে।

আবার মহাকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে মহাকাশ যানটি নির্বিঘ্নে নামল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে।

সে তারিখটি হল ২৪শে জুলাই, ১৯৬৯। মানুষ এর আগে চাঁদ সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রজয়ের ফলে তার থেকে আরও নতুন তথ্য জানা গেল।

জানা গেল চাঁদে বায়ু নেই, জল নেই। কাজেই চাঁদের প্রাণ বা প্রাণের বিষয়ের কোন কথাই ওঠে না।

নিষ্প্রাণ এই চাঁদের দেশ—সুন্দর, অতি সুন্দর।

চাঁদের মাটির স্তরে রয়েছে পাউডারের মত পিচ্ছিল ধূলো তাতে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে ছোট বড় নানা রকমের নুড়ি পাথর।

চাঁদের রাজ্যে মানুষের দৃষ্টি বেশী দূর যেতে পারে না।

শুধু তার মধ্যে দেখা গেছে ছোট বড় পাহাড় বা জ্বালামুখ।

চাঁদের বয়স নাকি সাড়ে চারশো কোটি বছর। প্রায় পৃথিবীর সমান।…

অথচ পৃথিবী শস্য-শ্যামল কোটি কোটি প্রাণের কল-কোলাহলে জীবন্ত…

কিন্তু চাঁদ এখনও জড় পিণ্ডমাত্র।

———

।। রহস্যময় পাহাড়ের অজানা তথ্য ।।

আমাদের এই ভারতবর্ষের উত্তরে যে পাহাড় রয়েছে এই পাহাড়ের নাম হিমালয়।

মাইলের পর মাইল এই বিস্তৃত পাহাড়। এত বড়ো. এত উঁচু, এতো বিস্তৃত পর্বতমালা এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর নেই।

এই পর্বতমালার কোনো কোনো শৃঙ্গ অস্বাভাবিক উঁচু। এত উঁচু যে তার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও নেই। এই সব পর্বতশৃঙ্গের কত না সুন্দর সুন্দর নাম।

এই পাহাড়েই রয়েছে বড়ো বড়ো নদীর উৎস, রাশি রাশি ঝর্না। কত যে স্রোতস্বতী বেগবতী নদীর জন্ম দিয়েছে এই পর্বতমালা, তাদের সংখ্যা ভাবতে গেলে রীতিমত বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

পাহাড়ের কোলে সুন্দর সুন্দর উপত্যকা।

কোমল মখমলের মত নরম সবুজে ঢাকা। ঠিক যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত। পাহাড়ের এই পাদদেশে চরে বেড়াচ্ছে গরু, চরছে মোষের পাল। লোমশ ছাগলও ইতিউতি দেখা যায়।

তবে বৈচিত্র্য এখানে নয় বৈচিত্র্য রয়েছে সুদুর্গম পাহাড়ে। কোথাও পাহাড় উঠেছে ধাপে ধাপে, কোথাও বা এই পাহাড় প্রাচীরের মত খাড়া। এমনকি সামনের দিকে ঝুঁকে থাকাও বিচিত্র নয়। এই ঝুঁকে থাকা মাথায় থাকে থাকে ঝুলন্ত বরফের চাঁই।

পাহাড়ের গা বেয়ে মাঝে মাঝে ধস নামে। হাজার হাজার টন বরফ উদ্বেলিত—মহাসাগরের মেঘচুম্বী তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত আছড়ে

নেমে আসে। বরফের ধোঁয়ায় তখন চারদিক আছন্ন হয়ে যায়। প্রচণ্ড গর্জনে চারদিকে বেধে যায় প্রলয় কাণ্ড।

এতো বড় উঁচু পাহাড়ে প্রায়ই লেগে থাকে ঝড়। প্রায়ই। মরু ঝড়ের মত এ ঝড় ভয়ঙ্কর। পাহাড়ের পরিভাষায় একে বলে রিজার্ভ। এ ঝড়ে পড়লে কোন প্রাণীই জীবন নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত এই পর্বতমালার ভেতর এরকম কত যে আছে তা এক কথায় বলা যায় না।

সমতল ভূমির যারা অধিবাসী তারা এত সব ভাবতেই পারে না। কখনো দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠলে মাথা ঘোরে, কখনো বা বরফের তেজে থেমে যায় অন্ধ হয়ে। আর বরফের বাষ্প তো আছেই। এখানকার শৈত্য এত প্রচণ্ড যে গরম পোশাকের বাইরে একটুখানি কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি বেরিয়ে আসে, তবে তখনই তা ঐ ঠাণ্ডায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে জমে যায়। পরে সেখানটি নীল হয়ে পচে যেতে থাকে। একেই বলে বরফের কামড়। পাহাড়ী পরিভাষায় 'তুষার খাত'। এই 'তুষার ক্ষত'-এ আক্রান্ত হলে মানুষ বাঁচে না। যে অঙ্গে তুষার ক্ষত হয়, বাঁচতে হলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানটি কেটে বাদ দিতে হবে।

কিন্তু মানুষ কী তা মেনে নিতে পারে? না। যে মানুষ পায়ে পায়ে সমগ্র ঘুরে পৃথিবীকে মানচিত্রে ধরে ফেলেছে, যে অস্বীকার করেছে মহাসাগরের ব্যবধান, যে জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞান বিতরণে জীবনের পরোয়া পর্যন্ত করেনি, পাহাড় কি কখনো দূরে ঠেলে রাখতে পারে? পারে না।

পাহাড় জয়ের নেশায় প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইউরোপীয়রা। ইউরোপীয় যুবকেরা চিরকালই ডাকাবুকো। চিরকালই বেপরোয়া।

জীবনকে তুচ্ছ করে বহু দুর্গমকে ওরা জয় করেছে। পাহাড় জয়েরও ব্যাপারেও ওরা তাই করল। ওরা পাহাড় অভিযান করার জন্য তৈরী করল ক্লাব।

পাহাড় অভিযান নিয়ে অনেক পড়াশোনা করলেন। আল্পস পর্বতমালায় ঘোরাফেরা করে অর্জন করলেন অনেক অভিজ্ঞতা। তারপর এগিয়ে গেলেন পাহাড়াধিরাজ হিমালয়ের শৃঙ্গ অভিযানে। কেউ গেলেন নেপাল গাড়োয়ালের পথে, কেউ ধরলেন হরিদ্বার ছেত্রী মঠের পথ, আবার কেউ বা এলেন চীন ঘুরে।

অগম্য এই পাহাড়ী অভিযানে যে কেউ এগিয়ে আসুক না কেন, সাথী হিসাবে তাদের নিতে হত শেরপাদের। এই শেরপারা হলেন পাহাড়ী অঞ্চলেরই লোক ; গিরিরাজ হিমালয়ের মেজাজ মর্জির সঙ্গে এরা বিশেষ ভাবে পরিচিত। প্রতিটি শৃঙ্গ বিজয়ে এদের দান অনেকখানি।

আজ এভারেষ্ট বিজয়ে হিলারীর সঙ্গে শেরপা তেনজিং নোরগের নাম যে সোনার অক্ষরে লেখা আছে তা বোধহয় নতুন করে জানার অপেক্ষা রাখে না। এই শেরপারা যে আমাদের দেশের লোক, এই-টুকুই আমাদের গৌরব। নইলে হিমালয় অভিযানের ব্যাপারে আমাদের দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে এরই ভেতর একটু ব্যতিক্রম আছে। সেই ব্যতিক্রমের নায়ক হলেন পাহাড় প্রেমিক নান্দু। পুরো নাম নান্দু জয়াল। উত্তর ভারতের ছেলে নান্দু। জন্ম হিমালয়ের গাড়োয়াল। পাহাড়ী পরিবারের ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই ডাকাবুকো। আর ভীষণ সাহসী। দেরাদুনের 'দুন' স্কুলে নান্দু পড়তে এলো। তখন থেকেই

সে ছিল চোখে পড়বার মতন। তখন থেকেই দুরন্ত, দুর্দান্ত অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

হোল্ডওয়ার্থ নামে এক পাহাড় প্রেমিক সাহেব ছিলেন এই পুন স্কুলে। এই সাহেবের নজরে পড়ে গেলেন নান্দু। সাহেব এই নান্দুকে গড়েপিঠে একজন শ্রেষ্ঠ পাহাড় আরোহী করতে চাইলেন। এবং একটু চেষ্টা করে তা পারলেন।

আগেই বলা হয়েছে হিমালয় মানে নিষেধের দুর্গ।

পথে পথে জমে আছে বিপদ।

পদে পদে আছে অনিবার্য মৃত্যু।

এই মৃত্যুকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হোল্ডওয়ার্থ সাহেব তাঁর প্রিয় শিষ্য নান্দুকে নিয়ে হিমালয়ের হাজার ফিট উঁচুতে উঠতে আরম্ভ করলেন।

তের বছর বয়স থেকেই এর আরম্ভ।

নান্দুর বয়স তখন সবে পনেরো, হোল্ডওয়ার্থ সাহেব তাঁকে তখন নিয়ে গেলেন অরোরা হিমালয়ে। সঙ্গে আরেক সাহেব মার্টিন।

ঐ মার্টিনের সঙ্গে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে উঠল নান্দু।

ভ্রমণে বেরিয়ে তরুণ মার্কো যে আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দ আজ নান্দুর চোখে মুখে।

আর কলম্বাসের মতন দৃঢ় কঠিন সঙ্কল্প এই কিশোরের চিত্তে। অরোরার হিমালয়ের চোদ্দ হাজার ফিট উচ্চতায় ওঠার পরই দেখা গেল তুষার ঝড়। ইংরেজীতে যাকে বলে 'রিজার্ভ'। সেই জিনিস, যার ফলে অভিযান হল পরিত্যক্ত।

এর পর আবার অভিযান।

অভিযানের পর অভিযান।

মাস্টারমশাই হোল্ডওয়ার্থ তাঁর ছাত্রকে নিয়ে গেলেন আরেক হিমবাহে।

নীলকণ্ঠের দক্ষিণ পূর্বে এই হিমবাহ।

সেখানে তুষার ঝড়ের দেখা মিলল।

হিমালয়ের বিশাল সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় এঁরা হানা দিতে আরম্ভ করলেন।

পাহাড়ী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মজার মজার ঘটনারও এঁরা সাক্ষী হলেন।

একবার এই গুরু এবং তার চেলা কুয়ারী পাস হয়ে চলেছেন রাণীক্ষেতের দিকে।

রাণীক্ষেতে এসে এঁরা কৌতুককর এক ঘটনায় পড়ে গেলেন।

তখন এঁদের পোশাক-আসাক নোংরা। কেমন যেন এক ছন্ন-ছাড়া ভাব। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এঁরা বুঝি পলাতক।

পুলিশের চোখে শেষপর্যন্ত তাই হল, সঙ্গে সঙ্গে এরা হয়ে গেলেন গ্রেপ্তার।

অভিযোগ?

অভিযোগ খুব সরল।

গুরু হোল্ডওয়ার্থের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল এই, তিনি পালিয়ে আসা যুদ্ধবন্দী।

আর নান্দুকে ধরা হল তাঁর যুদ্ধের শাগরেদ হিসাবে।

তবে ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াল না। কেননা, অল্প সময়ের ভেতর এঁদের পরিচয় জানাজানি হয়ে গেল। সুতরাং ছাড়াও পেয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

বরফ ঢাকা পথে, আর সে পথ যদি একটু ঢালু হয়, দ্রুত অতিক্রমণের পক্ষে 'সী' করার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য।

ওলমার্গের 'সী' স্কুলে এই বিদ্যা শেখাবার জন্য গিয়ে ভর্তি হলেন নান্দু। আর, অল্প সময়ের ভেতর সেখানে যে কৃতিত্ব দেখালেন তা দেখে সকলে অবাক।

আর রাউলপিণ্ডিতে গিয়ে পাহাড়ের সুদীর্ঘ বরফঢাকা পথে 'সী' কেটে সকলকে আবার তাজ্জব করে দিলেন।

'দু' বছরের ভেতরে এখানে নিযুক্ত হলেন শিক্ষক, পরে প্রধান শিক্ষক।

এরপর একে একে এলো নান্দুর প্রতিভার স্বীকৃতি। এলো জয়ের মালা। সেবার নান্দু জয়াল গেলেন অস্ট্রিয়ায়। সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'সী' প্রতিযোগিতা। বিশ্ববিখ্যাত 'সী' শিক্ষকরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন। সেখানে সকলকে হারিয়ে দিয়ে নান্দু হয়ে গেলেন ফার্স্ট। বিশ্বের এই সেরা সম্মান শিক্ষকে ভূষিত হলে গুরু হোল্ডওয়ার্থ বললেন, যোগ্য লোককে সম্মান দিয়ে অস্ট্রিয়ানরা এতদিনে নিজেরাই হলেন সম্মানিত।

নান্দু গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানেও তার জয়জয়কার। পেলেন বিশ্বের এক প্রশংসাপত্র, আর পেলেন 'বিশেষ কৃতিত্ব ব্যাজ'।

এ কৃতিত্বের তুলনা বিরল।

নিজের দেশের অধিবাসী নন। এরকম লোককে এই সম্মান তাঁরা প্রথম দিলেন।

এ ব্যাপারে ইংরেজরাই পিছিয়ে থাকে কেন?

এরা তাঁকে আলপাইন ক্লাবের অনারারি সদস্য হিসাবে নিয়ে গেল পর্বতের গল্প শুনবে বলে?

এদিকে পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে অভিযান রইল অব্যাহত।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে নান্দু গিয়েছিলেন এক বার্মাদলের সঙ্গে। নন্দা-দেবীর অভিযানে। কিন্তু নন্দাদেবী অভিযানের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল বিয়োগান্ত ঘটনায়।

দলনেতা রবাড ডুয়াট এবং অভিযাত্রী গিলবার্ট চুড়োয় উঠবার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে সেই যে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি। গেলেন নিখোঁজ হয়ে। পাহাড়ে নিখোঁজ হওয়া মানেই মৃত্যু। এই দলে তেনজিংও ছিলেন। হারানো আরোহীদের খুঁজতে গিয়ে তেনজিং পাহাড়ের শৃঙ্গ জয় করে এলেন। তেনজিং-এর এই বিরাট সাফল্য পাহাড় প্রেমিক নান্দুর মনে এনে দিল এক আশ্চর্য অনুপ্রেরণা, বিরল সাহস।

পরের বছরে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে ভাল রকম কোন প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ২৫,৪৪৭ ফিট উঁচু কামেটের অভিযানে পুরো ভারতীয় দল নিয়ে। এ অভিযান কেবল ব্যর্থই হয়নি, নান্দুর প্রাণ যায় যায় হয়ে গিয়েছিল।

পূর্ব কামেট হিমবাহের ১৬ হাজার ফিট উঁচুতে যখন তিনি পথের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নিজের অজান্তেই তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন দল থেকে।

'মানা দেয়াজ' গিরিশিখার ওপর ঝুলন্ত বরফ তাঁর চোখের সামনেই রয়েছে। অকস্মাৎ অঘটন ঘটল।

ঐ ঝুলন্ত বরফের চাঁই হঠাৎ হুড়মুড় করে পড়ল ভেঙ্গে।

তারপর নামল বিরাট ধস্।

আঠাল নরম বরফের স্রোতধারা আরম্ভ করল চারদিক গ্রাস করতে।

পালাবার চেষ্টা করলেন নান্দু।

দ্রুতবেগে এগোতে থাকলেন উত্তরে। কিন্তু পালাবেন কোথায়? একবার পায়ের তলাতেই ফাটল বরফ। তারপর শিকার হয়ে গেলেন তুষার স্রোতধারায়। পায়ে 'সী' করবার কাঠ বাঁধা। কিন্তু 'সী' করবার সুযোগ পেলেন কই? ধীরে ধীরে ডুবতে আরম্ভ করলেন। কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। গেল অচল হয়ে।

না, এই চরম বিপদেও বুদ্ধি হারালেন না নান্দু। চিৎকার করে তিনি সঙ্গীদের পৌঁছে দিলেন তার বিপন্ন অবস্থা। 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে তিনি সহকারীদের ডাকতে থাকলেন। সহ-অভিযাত্রী ভগৎ সিং প্রাণ তুচ্ছ করে এসে নান্দুকে যখন উদ্ধার করলেন, নান্দু তখন মৃতপ্রায়।

শেষ পর্যন্ত এ অভিযানও ব্যর্থ হল, আর ঐ দুর্লভ প্রাণ ভগৎ সিং-কে চিরতরে পাহাড়ে রেখে এলেন নান্দু।

পরের বছর আবার কামেট বিজয়ে বেরোলেন এই পাহাড় শার্দূল নান্দু।

না, এবারেও বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্ন হলেন না। পরিবর্তে বিজিত হল আবিসামিন শীর্ষ।

উচ্চতা, চব্বিশ হাজার একশ ত্রিশ ফিট। ঐ উঁচু পাহাড়ের মাথায় উড়ল ভারতের তিন রঙা পতাকা।

তবে কামেটের ব্যাপারে নান্দু ছাড়বার পাত্র নয়। তাই মাঝে এক বছর বাদ দিয়ে ইনি আবার চললেন কামেটে।

উদ্ধত কামেটকে তিনি পদানত করবেনই।

দুর্ধর্ষ নান্দুর কাছে সত্যি সত্যিই সেবার মাথা নোয়াল শৃঙ্গশ্রেষ্ঠ কামেট।

ছাপান্ন সালে 'সাসের কাংরী' জয়ে বেরুলেন নান্দু। কারাকোরাম, হিমালয়ের এক একটি নাম করা চূড়া। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য 'সাসের কাংরী' জয় করা গেল না। তবে অভিযান ঘুরিয়ে বিজিত হয়ে গেল 'সাবাং'।

আটান্নতে নন্দাদেবীর 'আকর্ষণ' অনুভব করলেন নান্দু জয়াল।

পরিচালিত হল অভিযান।

তবে পাহাড় জয়ের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে বরাতের ওপর।

আবহাওয়া যদি অনুকূল হয়, প্রকৃতি যদি দুর্যোগের কবলে না পড়ে, তাহলে সহজ হয় পাহাড়ে ওঠা।

নন্দাদেবীর ব্যাপারে প্রথম দিকে সবই ঠিকঠাক ছিল, যদিও জয় চলে এসেছিল হাতের মুঠোয়, কিন্তু হঠাৎ দেবী নন্দা বিরূপ হলেন।

বদলে গেল আকাশের রঙ।

হা-হা করে ছুটে এল তুষার ঝড়। চারদিকে বেঁধে গেল প্রলয়। নান্দু ও শেরপা প্যান ম্যাসন আটকা পড়ে গেলেন মরণের ফাঁদে।

ভীষণ ঠাণ্ডায় শেরপা প্যান ম্যাসন হারিয়ে ফেললেন তাঁর চলবার শক্তি।

নান্দু এই ভীষণ পরিস্থিতিতে রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করলেন একা। শেরপার আহত দেহটাকে পিঠে নিয়ে ঐ দুর্গম পথ হাতড়ে হাতড়ে নেমে এলেন হামাগুঁড়ি দিয়ে।

নান্দুর জীবনে এই রকম পাহাড়ী অভিজ্ঞতা অনেক। বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেছেন তিনি অনেকবার।

মৃত্যুর সঙ্গে করেছেন পাঞ্জা।

এখানে তিনি দুর্বার।

পেশা হিসাবে গাড়োয়ালের এই কৃতি মানুষটি বেছে নিয়েছিলেন সৈনিকের বৃত্তি। আর নেশা হিসাবে ঐ পাহাড়। সৈনিকতায় প্রথমে নিয়েছিলেন 'এমারজেন্‌সি কমিশন'।

পরে পেয়ে গিয়েছিলেন স্থায়ী কমিশন! এখানেও কৃতিত্বের পুরস্কার।

পরে দার্জিলিং-এ পর্বতারোহীদের শিক্ষা দেবার জন্য 'মাউন-টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট'-এ অধ্যক্ষের চাকরি নিয়ে গেলেন।

কিন্তু এই অধ্যক্ষ পদের মোহও তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। শেষ পর্যন্ত।

সোমবার ১৯৫৮ সাল।

কে. এক্. বুলগার চলেছেন 'চৌ-চৌ' অভিযানে।

এই আরোহী দলের বিকল্প নেতা হবার আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন সাহেব পাহাড় প্রেমিক নান্দুকে। নান্দু রাজী।

দল এদিকে এগিয়ে চলে গেছে। তা যাক।

নান্দু দার্জিলিং-এর কাজে ইস্তফা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললেন তাদের ধরবার জন্য। ঐ ভাবে দ্রুত বেগে যাওয়া শীতের রাজ্যে পাহাড়ী স্বাস্থ্য বিধির পক্ষে অনুচিত।

পাহাড় তাই বেপরোয়া নান্দুকে এবার ক্ষমা করতে পারলেন না।

বরং বলা যায় এবার শোধ নিল। নির্মম প্রতিশোধ।

নান্দুকে ধরল নিউমোনিয়ায়। আর পাহাড়পুরীতে নিউমোনিয়া মানে সুনিশ্চিত মৃত্যু।

সেই সুনিশ্চিত মৃত্যুই শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল

পাহাড় শার্দূল দুর্ধর্ষ নান্দুকে। এই পাহাড় প্রেমিক মানুষটির বয়স তখন মোটে একত্রিশ অর্থাৎ ভরা যৌবন।

নগধিরাজ হিমালয় বিখ্যাত পাহাড়ী ম্যালরীকে ঘরে ফিরতে দেয় নি। ১৯২৪ সালে ম্যালরীকে টেনে নিয়েছিল নিজের কোলে। ১৯৫৫ সালে হারমান কুল চোখ বুঁজলেন এই তুষার শয্যায়······

১৯৫৮-তে আর একটি নাম সেই সঙ্গে যুক্ত হল।

সেই নামটি হল নান্দূ জয়াল।

॥ বিজ্ঞানের খেলাঘরে বিজ্ঞানীরা ॥

বিজ্ঞানবীর নিউটন তাঁর বাগানে বসে দেখলেন গাছ থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ল। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার ফলাফল বড় সামান্য নয়। নিউটন ভাবতে বসলেন, ফলটি মাটিতে পড়ল কেন ? জিনিসমাত্রই শূন্যে ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে কেন ? চারদিক জুড়ে এই প্রকাণ্ড আকাশ রয়েছে, তা ছেড়ে এই পৃথিবীর মাটির ওপরেই বা তার এত ঝোঁক কেন ? ভাবতে ভাবতে তিনি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে পৃথিবীটা তার আশেপাশের সমস্ত বস্তুকে টানে। কিন্তু শুধু কি পৃথিবীকেই টানে ? চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রও এদেরও কি সে শক্তি নেই ? আর শুধু কাছের জিনিসকেই পৃথিবী টানে ? অনেক দূর পর্যন্ত কি তার সে টান পৌঁছায় না। ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত হল এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি বস্তু অপর প্রত্যেকটি বস্তুকেই আকর্ষণ করে। যতদূর যাওয়া যায়, সে আকর্ষণ তত ক্ষীণ হয়ে আসে। এই পৃথিবী চন্দ্রকেও টানছে—চন্দ্রও পৃথিবীকে টানছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি মাটির ঢেলা, প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্যন্ত প্রত্যেকে প্রত্যেককে আকর্ষণ করছে। নিউটন প্রমাণ করে দেখালেন যে, এই পৃথিবীর গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি সকলেরই চলাফেরার ঠিকমতো হিসাব পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বড় তত্ত্বের আবিষ্কার আর দ্বিতীয় হয়নি বললেও চলে।

সে প্রায় আজ অনেক দিনের কথা। একদিন এক ইংরেজ বুড়ি তার জানলা দিয়ে দেখতে পেল যে পাশের বাড়িতে বাগানে বসে

একজন বয়স্ক লোক সারাদিন কেবল বুদবুদ ওড়াচ্ছেন। দুদিন চার-দিন ধরে এই রকম দেখে বুড়ি ভাবল লোকটা নিশ্চয় পাগল তা না হলে কাজ নেই, কর্ম নেই, কেবল ঘড়ি ঘোরার মতো বুদবুদ নিয়ে খেলা—এ আবার কোন দেশী আমোদ। বুড়ি তখন ব্যস্ত হয়ে থানায় খবর দিল।

যে লোকটি বুদবুদ ওড়াতেন, পুলিস তার খবর নিতে গিয়ে দেখল, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং স্যার আইজক নিউটন—যাঁর মতো অত বড় বিজ্ঞানী হাজার বছরে দ্বিতীয়টি পাওয়া দুষ্কর। বুদবুদের গায়ে যে রামধনুর মতো জমকালো রঙ দেখা যায় নিউটন তখন তার কারণ অনুসন্ধান করছিলেন। নিউটনের পরেও ইয়ং প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতরা এই বিষয়ে অনুসন্ধান নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন এবং তার ফলে আলোক জিনিসটা যে কি, এ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।

মেঘের গায়ে রামধনু রঙ দেখতে যে খুব সুন্দর তাতে আর সন্দেহ কি?

দেখলে সকলের মনে কৌতূহল জাগে, শুধু মেঘের গায়ে নয়, আলোকের রঙিন খেলা, স্ফটিক পাথর বা কাঁচের কাছে যেমন করে ঝিকমিক করে তা সকলেরই জানা। কিন্তু সাধারণের দেখায় আর পণ্ডিতদের দেখায় অনেক তফাত। নিউটন সেই রঙের খেলাকে নানা রকম খেলিয়ে দেখালেন, আসল ব্যাপারটা কি? তারপর এই ব্যাপারের সন্ধান করতে গিয়ে কত পণ্ডিত যে কত নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, তার আর অন্ত নেই। কিন্তু আজও তাদের কৌতূহল মেটেনি।

বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্রে সূর্যের আলোককে দেখায় যেন রামধনুর ফিতা। সেই ফিতার মধ্যে নানান রঙ যেমন করে

সাজানো থাকে তা পণ্ডিতরা হাজার রকমের উপায়ে তার পরীক্ষা করেছেন।

এক এক রকম আলোয় এক এক রকম রঙিন মালা। সূর্যের আলোকে বর্ণবীক্ষণে পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা বলেছেন যে—সূর্যের ভেতরে যেমন গরম তার বাইরে আগুনটা সে রকম গরম নয়। সূর্যের আলোকে এর একটা চিহ্ন দেখেন আর মেপে বলেন, এটা লোহার জ্যোতি, এটা হাইড্রোজেনের আলো, এটা গন্ধকের চিহ্ন, এটা অঙ্গারের স্বরূপ, এটা ক্ষারের ধাতু, এটা চুনের ধাতু ইত্যাদি। তারার আলোর রামধনু ফলিয়ে তাঁরা বলতে পারেন এই তারাটা গ্যাসের পিণ্ড। এই তারাটা জমাট আগুন। এই তারাটা বাষ্পে বাঁধা। এই সমস্ত সংকেত লিখবার মূলে স্যার আইজক নিউটনের ঐ রামধনু দেখবার কৌতূহল।

একটি মরা ব্যাঙের নাচন দেখে বিদ্যুৎ প্রবাহের আবিষ্কার হয়। গ্যালভিন নামে এক ইটালিয়ান পণ্ডিত পরীক্ষার জন্য একটা ব্যাঙ কেটে একটা লোহার শলাকায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। খানিক পরে তাঁর স্ত্রী দেখেন, সেই মরা ব্যাঙের ঠ্যাংটি এক একবার ঝুলে পড়ছে আর এক একবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে। তিনি যদি এটাকে ভূতড়ে কাণ্ড ভেবে ভয়ে পালাতেন তবে তার আর বিদ্যুতের তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হত না। তিনি ভয় পেলেন না।

বরং এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জানবার জন্য তার কৌতূহল জমে উঠল। তখন দেখা গেল, ঐ ব্যাঙের পায়ের নীচে এক টুকরো তামা রয়েছে। তাতে যতবার পা ঠেকছে ততবারই মরা ব্যাঙটা নেচে উঠছে। গ্যালভিনও খবর পেয়ে দেখতে এলেন ব্যাপারটা। আর পরীক্ষা করে দেখলেন যে ওটা বিদ্যুতেরই কাণ্ড। এখন এই

যে শহরে শহরে বিদ্যুতের কারখানা রয়েছে আর তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে ঘরে ঘরে পাখা চলছে, আলো জ্বলছে এবং এর গোড়াকার ইতিহাস যদি লিখতে হয়, তার মধ্যে ঐ ব্যাঙের নাচন-ধারাও উল্লেখ থাকবে।

ভেড়ার লোম কেটে পশম তৈরী হয়, তাকে কাজে লাগাবার আগে তার জট ছাড়িয়ে আঁশ আলগা করা দরকার। এই কাজ আগে হাতে করতে হত, পরে জট ছাড়াবার কলের সৃষ্টি হওয়াতে এখন ও কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। যাঁদের চেষ্টায় এই কলের সৃষ্টি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হাইম্যান নামে এক পশমওয়ালা। তিনি একদিন তার মেয়েদের চুল আঁচাড়ানো দেখে জানলেন, এই রকমভাবে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পশমের জট ছাড়ানো হয় না কেন? তিনি জট ছাড়াবার জন্য চিরুনির কল করলেন, তাতে পশম-ওয়ালার কাজের কত যে সুবিধা হল তা বলে শেষ করা যায় না।

এলিয়াস হাউস আমেরিকার লোক। তাঁর বাল্যকালের নাম ছিল বিনি। 'সেলাইয়ের কল' বানাবেন। সে সময়ে সেলাইরের কাজকর্ম সমস্তই হাতে করতে হত। কিন্তু হাউস ভাবলেন, এত রকম কাজ কলে হচ্ছে আর সেলাইটা হতে পারবে না কেন? তিনি অনেক দিন ধরে এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু সূচযুদ্ধ সুতোটাকে কাপড়ের ভেতর দিয়ে পারাপার করতে গিয়ে মহাসমস্যায় পড়লেন। নানারকম ফন্দি খাটিয়েও এই কাজটিকে তিনি কলে লাগাতে পারলেন না। তখন তিনি এক রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন

দেখলেন—এক অসভ্য রাজা তাঁকে বন্দী করে হুকুম দিয়েছে এখনই আমাকে সেলাইয়ের কল বানিয়ে দাও, যদি না পায় তো তোমায় মেরে ফেলব। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সেলাইয়ের কল বানানো গেল না। রাজা হুকুম দিলেন, 'মারো একে, তখন কতকগুলো লোক বল্লম দিয়ে তাঁকে মারতে এল। হাউস দেখতে পেলেন, সেই বল্লমের মুখের ফলকের মাথায় একটা ফুঁটো।

তৎক্ষণাৎ হাউসের ঘুম ভেঙে গেল, তিনি উঠে বসতেই সর্বপ্রথমে তাঁর মনে হলো, বল্লমের মুখের কাছে ফুঁটোটার কথা। তিনি ভাবলেন, এই তো ঠিক হয়েছে। কলের ছুঁচের পিছনে সুতো না দিয়ে এ রকম মুখের কাছে সুতো দিলেই তো কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। শেষকালে পরীক্ষায় তাই দেখা গেল—সেলাইয়ের কল করবার পক্ষে আর কোন বাধাই রইল না। এই হল সেলাই কলের ইতিহাস।

সেকালে ইংলণ্ডে 'জেমস হারগ্রীডস' নামে একজন দুঃস্থ তাঁতী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রান্নাবান্না ক'রে যে সময়টুকু পেতেন সে সময়টুকু সুতো কেটেই কাটাতেন।

একদিন সুতো কাটবার সময় হঠাৎ তাঁর চরকার মাকুটা খুলে মাটিতে পড়ে গেল। তাঁতী হারগ্রীডসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে মাকুটা মাটিতে পড়ে গিয়েও লাট্টুর মত দিব্যি ঘুরছে। তাই দেখে হারগ্রীডসের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

তিনি ভাবলেন, একটা মাকুর বদলে বদি অনেকগুলো মাকু একই অবস্থায় রাখা যায়, তা হলে তো সেগুলোকে একটা চাকার সাহায্যেই ঘোরানো যেতে পারে।

এই ভেবে হারগ্রীডস ধৈর্যের সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। বেশ

কয়েক বছর ধরে শেষে তিনি একটা কল তৈরী করলেন। সে কলে একগাছা সুতোর বদলে দশ গাছা সুতো একসঙ্গে তৈরী করা সম্ভব হলো। হারগ্রীভস তাঁর স্ত্রী জেনীর নামে সুতো তৈরীর সেই কলের নাম রাখলেন 'স্পিনিং জেনি'। আর এই স্পিনিং জেনিই প্রথম সুতো তৈরীর কল।

গ্রামোফোনের কথা কে না জানে? কিন্তু শব্দকে যন্ত্রের সাহায্যে ধরে রাখা কিন্তু মানুষের কল্পনায় আগে আসেনি। এডিসন যখন ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করেন তখন তাঁর ভাবগতিক দেখে তাঁর কর্মচারীরা কেউ কেউ ভয় পেয়েছিল। ঘরে মানুষ নেই, তিনি কেবল একটা চোঙার সঙ্গে কথা বলছেন তারপর চোঙার মুখে কান পেতে কি যেন শুনছেন। এই রকম ব্যাপার তারা সর্বদাই দেখত। তারপর এডিসন যখন তাদের ডেকে কলের আওয়াজ শোনালেন তখনও কলের মধ্যে মানুষের গলার শব্দ শুনে তাদের ভয় ঘোচেনি, কিন্তু এইটুকু তারা বুঝেছিল যে ব্যাপারটা নেহাত পাগলের খেলা নয়।

॥ প্রকৃতি বিজ্ঞানে উদ্ভিদের অবদান ॥

গ্রামের পথে অথবা শহরের রাস্তায় চলার সময় মাঠে বা বাগানে বেড়াবার সময় নানা রকম উদ্ভিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

জলের মধ্যে উদ্ভিদ দেখা যায়। তাদের মধ্যে অনেকে মাটির সঙ্গে সংযোগ রাখে না। যেমন জলশ্যাওলা। ভিজে মাটিতেও শ্যাওলা দেখা যায়। সাধারণত উদ্ভিদের পাতা সবুজ। আবার প্রায় বর্ণহীন উদ্ভিদও আছে, যেমন ব্যাঙের ছাতা। যাদের ভাল কথায় বলা হয় ছত্রাক।

আমরা সাধারণত ঘাসজাতীয়, লতাজাতীয়, ও শস্য কাণ্ডের গুল্ম জাতীয় ও বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ দেখি। এইসব উদ্ভিদের ফুল ধরে ও তা থেকে ফল হয়। ফলের মধ্যে থাকে বীজ। বীজ হতে নতুন উদ্ভিদের চারা জন্মায়। কিন্তু শ্যাওলা, ব্যাঙের ছাতা এদের ফুল ফল হয় না। এরা ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ। গম, ধান, বেগুন গাছ, আম গাছ, ছোলা গাছ, জাম গাছ, গাঁদা গাছ, সীম গাছ এদের সবারই ফুল হয়।

উদ্ভিদকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যে সব উদ্ভিদের ফুল হয় না তা অপুষ্পক শ্রেণীর এবং যে উদ্ভিদের ফুল হয় তারা সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ। আমাদের পরিচিত অপুষ্পক ও সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদের একটা তালিকা যদি আমরা তৈরী করি তাহলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

ফুল গাছের শোভা।

আমরা ফুলের জন্যই অনেক রকম গাছ যত্ন করে রোপণ করি।

কিন্তু গাছ শোভা সৃষ্টির জন্যই ফুল ধারণ করে না। তার প্রধান উদ্দেশ্য হল ফল সৃষ্টি করা। ফলের মধ্যে থাকে বীজ, সেই বীজ হতেই নতুন বীজ জন্মায়। এইভাবে উদ্ভিদ বংশধারা বিস্তার করে থাকে।

ধান, গম, ছোলা প্রভৃতির বীজ শুকনো অবস্থায় বছরের পর বছর রেখে দিলেও তা থেকে চারা বের হয় না। কিন্তু ভিজে ধান গম ছোলা থেকে সকলেরই অঙ্কুর বের হয়। বীজের অঙ্কুর বের হওয়ার একটা শর্ত হল জলে ভেজা। কিন্তু এক গ্লাস জলের মধ্যে যদি দু-চার দিন ছোলা বীজ রাখা যায় তাহলে তা থেকে স্বাভাবিক অঙ্কুর বের হয় না। ঐ ছোলা বের করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে অঙ্কুর বের হয়েছিল কিন্তু মরে গেছে। তার কারণ অঙ্কুর-গুলি জলের তলায় যথেষ্ট বাতাস পায়নি। বাতাসের অভাবে প্রাণীরা যেমন বাঁচে না, উদ্ভিদরাও তাই। পরীক্ষাটি আরো ভালো ভাবে করতে হলে একটি পাত্রে ছোলা বীজ কিংবা সরষে বীজ নিয়ে পাত্রের মধ্যে অল্প মাত্রায় জল রাখতে হবে যেন বীজগুলি পুরোটা ডুবে না যায়। আর একটি পাত্রে বীজ রাখতে হবে কিন্তু তাতে বেশী করে জল দিতে হবে যেন বীজগুলি জলের মধ্যে ভাল ভাবে ডুবে থাকে। দু-তিন দিন পরে দেখা যাবে প্রথম পাত্রের ডুবে না যাওয়া বীজগুলির অঙ্কুর বের হয়েছে। কারণ, তারা জল ও বাতাস দুই-ই পেয়েছে। দ্বিতীয় পাত্রে দেখা যাবে একটিও বীজ অঙ্কুরিত হয়নি, কারণ জলের মধ্যে ডুবে যাবার জন্য তারা যথেষ্ট বাতাস পায়নি। তাই অঙ্কুরোদ্গমের দ্বিতীয় শর্ত হল বাতাস।

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের আর একটি শর্ত আছে তা হল উত্তাপ। এই জন্যেই শীতকালে সহজে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। যদি থার্মোফ্লাস্ক থাকে তাতে কিছু বরফের টুকরো রেখে ভিজে বা ব্লটিং কাগজে জড়িয়ে সরষে বা ছোলার বীজ রাখলে তা থেকে অঙ্কুর বের হয় না। কিন্তু ঐভাবে বাইরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বীজগুলি রাখলে

তা থেকে সহজেই অঙ্কুর বের হবে। যেখানে বরফ পাওয়া যায় সেখানে বরফ আর কাঠের গুঁড়োতে বীজ রেখে এবং বরফ না দেওয়া ভিজে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে বীজ রেখে পরীক্ষাটি করা যেতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য তিনটি শর্তের প্রয়োজন, জল, বাতাস ও উষ্ণতা।

গাছের অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার অর্থ বীজ হতে চারা বের করা। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার সঙ্গে এর তুলনা চলে। ডিমের ভেতরে বাচ্চাটি থাকে ভ্রূণ অবস্থায়। ভ্রূণ অবস্থা ও জীবন্ত প্রাণীর অবস্থা এক নয়। কিন্তু তা বলে মৃত অবস্থা মোটেই নয়। এখানে জীবন যেন ঘুমিয়ে আছে। তাপ পেলে তার ঘুম ভাঙে। তখন সেই জীবন্ত শিশুর চাই খাদ্য। প্রাণীর ডিমের মধ্যে সেই খাদ্য থাকে আধা তরল অবস্থায়। ডিমের সাদা অংশটি খাদ্য। বীজের মধ্যে উদ্ভিদ ভ্রূণের খাদ্য থাকে শুকনো অবস্থায়। তাই বীজকে জলে ভেজানো দরকার। জলে ভেজা বীজ থেকে তরল খাদ্য গ্রহণ করে উদ্ভিদের ভ্রূণটি বড় হয়ে ওঠে এবং বীজের খোসা বিদীর্ণ করে বাইরে আসে। কিন্তু পাখির বাচ্চা ডিম থেকে বের হবার পর তাকে খাদ্য যোগায় তার মা-বাবা। উদ্ভিদ চারা গাছ হতে কিভাবে খাদ্য পাবে ? সে তার নিজের খাদ্য নিজেই তৈরী করে নেয়। বীজ হতে বের হওয়া চারাটির একটি অংশ মাটিতে প্রবেশ করে আমরা সেটিকে মূল বা শেকড় বলি।

শেকড়ের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত মাটির সার পদার্থ (নানা রকম খনিজ লবণ) সংগ্রহ করে থাকে। উদ্ভিদ তার সবুজ পাতায় এবং অন্যান্য সবুজ অংশে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নামে একরকম গ্যাসীয় পদার্থ গ্রহণ করে। সূর্যালোকের

উপস্থিতিতে প্রথমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরী করে, তারপর তা থেকে নানারকম জটিল খাদ্য তৈরী করে। এই সময় শেকড়ের সাহায্যে টেনে নেওয়া মাটির জল ও সার পদার্থগুলির প্রয়োজন হয়। এই ভাবে উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে নানারকম সরল উপাদান, যেমন জল, সার পদার্থ, কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে তা থেকে জটিল খাদ্য তৈরী করে থাকে। প্রাণীরা তা করে না। এ ব্যাপারে তারা উদ্ভিদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। উদ্ভিদের তৈরী খাদ্য গ্রহণ করেই তাঁদের বেঁচে থাকতে হয়।

খাদ্য বিয়য়ে প্রাণী মাত্রই উদ্ভিদের কাছে ঋণী তা আমরা জানলাম। এছাড়া উদ্ভিদ আমাদের নানাভাবে অনেক উপকার করে। উদ্ভিদ বাতাসের উপাদানগুলির সমতা রক্ষা করে থাকে। বাতাসে অক্সিজেন গ্যাস আছে তা প্রাণী শ্বাস গ্রহণের সময় গ্রহণ করে এবং তার পরিবর্তে দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসে যোগ করে। আমরা আগুন জ্বালানোর সময় বিপুল পরিমাণে বাতাসের অক্সিজেন গ্যাস বিনষ্ট করে থাকি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসে যোগ করে থাকি। এইভাবে চলতে থাকলে বাতাসে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্যাস ক্রমশ ফুরিয়ে যেত এবং দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভাগ বাতাসে অত্যন্ত বেড়ে যেত। তখন জীব-জন্তুর বেঁচে থাকাই অসম্ভব হত। উদ্ভিদ বাতাসের এই পরিবর্তন বোধ করে থাকে—উদ্ভিদ দিনের বেলায় সবুজ পাতায় খাদ্য তৈরীর সময় বাতাস থেকে বিপুল পরিমাণে দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস যোগ করে তার ফলে বাতাস পরিপূর্ণ হয়। এছাড়া কলকারখানা থেকে উৎপন্ন

নানারকম দূষিত গ্যাস শোষণ করে ও বাতাসে ভাসমান ক্ষতিকর সূক্ষ্ম ধূলিকণা সংগ্রহ করে বাতাসের দূষণ প্রতিরোধ করে।

উদ্ভিদ তার শেকড়ের সাহায্যে সূক্ষ্ম ও মৃত্তিকা কণাগুলিকে আটকে রাখে, নইলে এগুলি বায়ু প্রবাহে অথবা বর্ষণের সময় জলের সঙ্গে ধুয়ে শেষ পর্যন্ত নদী ও বাঁধগুলির ওপরে জমা হত। তাতে নদী ও বাঁধের জলধারণের ক্ষমতা কমে যেত এবং নদীগুলিতে ভয়াবহ আকার সৃষ্টি হত। উদ্ভিদ এইভাবে ভূমিস্তর ভেদ করে এবং বন্যার আশঙ্কা দূর করে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে বহু রকম উদ্ভিদের পদার্থ নানা ভাবে ব্যবহার করে আসছি। এর মধ্যে বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ভেষজ ও বিবিধ রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি অন্যতম।

কাজেই উদ্ভিদ ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না।

॥ রেডিয়ম ॥

'এক্স-রে' আবিষ্কার পদার্থ বিজ্ঞানের এক নব যুগ। রন্টজেন 'এক্স-রে' রহস্য জানিয়ে দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক বেঞ্জারেল পরীক্ষা আরম্ভ করলেন—রন্টজেন যেভাবে এক্স-রে আবিষ্কার করেছেন তা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা বের করা যায় কিনা ?

আর অন্যদিকে মেরী কুরীও এই বিষয়ে গবেষণা করলেন।

মেরী কুরীর পিতা পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ শহরের একটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না।

তিনি নিজেই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কিনে দিতেন।

মেরীও এই বিদ্যালয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন।

এই সময়ে তাঁকে জারের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে প্যারিসে আসতে হল।

তাঁর কোন সম্বল ছিল না।

প্রতিভা ও বুদ্ধিই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। এখানে তিনি কিছুই সুযোগ-সুবিধা করতে না পেরে প্যারিসের এক পল্লীতে একটি বাড়ী ভাড়া নিলেন।

এখানে মেরী এক রসায়নগারে অতি সামান্য বেতনে একটি সামান্য চাকরি নিলেন।

কুরীর কাজে এখানকার নিয়োগ কর্তা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

তখন কুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন পিরী কুরী।

মেরী তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনা করতেন।

অধ্যাপকও মেরীর সাথে বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র এবং নিজেই সমস্ত কাজকর্ম করতেন।

এই অধ্যাপকের সাথে মেরীর বিবাহ হল।

তারপর দু'জনেই বিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করলেন।

পিরী কুরী যে বিষয়ে মীমাংসা করতে না পারেন, তা মেরী মীমাংসা করতেন।

আর মেরীও যা সুরাহা করতে পারতেন না, পিরী কুরী তার সমাধান করতেন।

এমনি করে তাঁদের দিন চলে।

রন্টজেনের এক্স-রে দুজনকেই বেশ আকৃষ্ট করল।

এই বিষয়ে মেরী প্রথমে গবেষণা আরম্ভ করলেন। কুরী-দম্পতি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র।

তাঁদের কোন আলাদা গবেষণাগার ছিল না, যেখানে তাঁরা গবেষণা করতে পারেন।

এমনকি গবেষণা করবার যন্ত্রপাতিও ছিল না।

তাঁরা এক অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে কয়েকটি যন্ত্র নিয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ করলেন।

কিন্তু অধ্যাপকের এতে সে রকম কোন উৎসাহ ছিল না।

মেরী একাই এইসব গবেষণা করবার কাজ আরম্ভ করলেন।

মেরী দেখলেন, পিচব্লেড থেকে ইউরেনিয়াম বের করে নেবার পর বাকী অংশ অপ্রয়োজনীয় বলে তাকে কোনো কাজে লাগান যায় না। কিন্তু ঐ অংশের তেজ ইউরেনিয়ামের তেজের অপেক্ষা অনেক বেশী।

মেরী পিরী কুরীকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন। এখন মেরীর কাজে পিরী কুরীও লেগে গেলেন।

ভবিষ্যতের মধ্যে কি আছে কে জানে? এও তাঁদের অজানা।

এই কাজে পিচব্লেড বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এছাড়া কিছুতেই সাফল্য আসে না।

এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

কোথা থেকে পাবেন এত পিচব্লেড? তারা তাই হতাশ হয়ে গেলেন।…

পিচব্লেড পেলে হয়তো তাঁদের গবেষণা সাফল্য লাভ করত।

খবর পেয়ে অস্ট্রিয়া সরকার খনি থেকে পিচব্লেড তুলে কুরীর কাজে পাঠালেন।

তখন তাঁদের আনন্দ আর ধরে না।

নতুন গবেষণায় পিচব্লেড থেকে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল। তা ইউরেনিয়ামের চেয়েও বেশী তেজস্কর। মেরী এর নাম দিলেন—পলোনিয়ম।

পলোনিয়মের চেয়ে বেশী তেজস্কর পদার্থ এর মধ্যে পাওয়া যাবে এই ছিল তাঁর ধারণা।

মেরী এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

মাসের পর মাস কেটে গেল। মেরী তবুও ধৈর্য সহকারে গবেষণা করতে লাগলেন।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দ।

মেরী তখন এক নতুন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেলেন।

এটা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা শতগুণ তেজস্কর। রেডিয়ম।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ।

মেরী রেডিয়ম আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন।

এই আবিষ্কারে সমগ্র জগতে এক আলোড়ন পড়ে গেল।

রেডিয়ম থেকে সকল সময় একপ্রকার রশ্মি ছড়ায়···

অন্ধকারেও এর থেকে জ্যোতি বের হয় আবার তাপও দেয়।

রেডিয়ম আবিষ্কারের জন্য কুরী-দম্পতি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এই সঙ্গে বেয়াবোল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

রয়াল সোসাইটি থেকে কুরী-দম্পতি সুবর্ণপদক পেলেন।

চিকিৎসা জগতে রেডিয়ম একটি মহামূল্য পদার্থ।

ক্যানসার রোগে রেডিয়ম ব্যবহার করা হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—পলোনিয়ম রেডিয়ম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দ।

মেরী খাঁটি পলোনিয়ম ও রেডিয়ম আবিষ্কার করলেন।

মেরী আবার নোবেল পুরস্কার পেলেন। এ পর্যন্ত কোন মহিলা একাধিক বার এই পুরস্কার লাভ করেননি।

মেরী কুরী 'রেডিয়ম ইনস্টিটিউট' নামক এক গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতে বহু অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য……

এমন একদিন গিয়েছে যখন রেডিয়ম আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করতে কুরী কোথাও একখানি ঘর পাননি।

———

॥ আবিষ্কারক রাধানাথ সিকদার ॥

ছেলেবেলায় ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দিকে দেখতাম, দীর্ঘ একটা কালির রেখা। উত্তর দিকে এঁকে বেঁকে চলেছে।

অবাক হয়ে ভাবতাম, এই মোটা কালির দাগটা কিসের? পরে যখন জেনেছিলাম, কালির দাগ নয়, ওটা হিমালয় পর্বত, বিস্ময় তখনও কমেনি।

শুনলাম এত বড় পর্বতশ্রেণী পৃথিবীর আর কোথায় নেই। অজানিত এর শৃঙ্গ। বড় হয়ে কালিদাসের কাব্যে এর স্তুতি দেখেছি। বুঝেছি হিমালয় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রহরী। শুধু প্রহরী কেন, পিতার মত স্নেহে ভারতের জীবনকেও হিমালয় বাঁচিয়ে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পড়তাম—

"হে গিরি, যৌবন তব দুর্গম অগ্নিতাপ রেখে, আপনারে উৎসরিয়া মরিতে চাহিয়াছিলে শেষে—"

হিমালয়ের অসংখ্য শৃঙ্গের মধ্যে তিনটি শৃঙ্গ সব থেকে উঁচু—

গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি।

মানুষের বড় হবার সাধের সীমা নেই। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার লোভে সে মরু ও মরুকে দু'পায়ে নীচে মিলিয়ে দিয়েছে। তার অভিযানের কাছে বিন্ধ্যাচলকে মাথা হেট করতে হয়েছে।

কিন্তু মানুষের স্পর্ধা হার মেনেছে হিমালয়ের কাছে। বার বার সে তার শৃঙ্গের ওপর আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশায় মেতেছে।

বার বার তার অদৃষ্টে জুটেছে হতাশা। গৌরীশঙ্কর বা এভারেস্ট কারও কাছে মাথা নত করেনি। কিন্তু আজ তার গগনস্পর্শী অভিযানকারীদের হাতে হার মেনেছে।

এভারেস্ট পর্বত বা গৌরীশিখরের উচ্চতা ২৯,১৪০ ফিট। প্রায় ছয় মাইলের কিছু কম। ভাবতেও বিস্ময় লাগে। এই বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দ এসে মেশে যখন ভাবি এভারেস্টের জরিপ করেছিলেন কোন বিদেশী নয় আমাদেরই মত একজন বাঙালী···এই সুজলা সুফলা প্রদেশের অধিবাসী আমাদের আপনজন।

এই বাঙালীর নাম রাধানাথ সিকদার।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার সিকদার বাগানে রাধানাথের জন্ম হয়। পড়াশোনায় বরাবরই তিনি অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র ১১ বছর বয়সেই তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন।

রাধানাথের গণিতশাস্ত্রে আগ্রহ ছিল অতুলনীয়। অক্লান্তভাবে গণিতশাস্ত্র পাঠ ও গণিতের চর্চা করতে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। বাঙালীদের মধ্যে শোনা যায়, তিনিই প্রথম নিউটনের বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' নামক পুস্তক করেন।

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ডিরোজিও। বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই তেজস্বী ফিরিঙ্গী শিক্ষকের প্রভাবে উনিশ শতকের সেই প্রথম যুগে শিক্ষা কতদূর ব্যাপক ছিল তা এককথায় প্রকাশ করা যায় না।

বাংলার তৎকালীন বহু সুসন্তানই যে এঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পড়ে প্রাচীন সংস্কারাদি ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, এ কথাটা অনেকের

জানা থাকবার কথা। ডিরোজিওর প্রভাবে একটি 'খ্রীষ্ট বঙ্গ' সমাজ গড়ে উঠেছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এঁদের অন্যতম।

এঁরা হিন্দুধর্মের যাবতীয় রীতিনীতিতেই কুসংস্কার বলে জ্ঞান করতেন। চিন্তায়, আচারে, ব্যবহারে পুরোপুরি সাহেব হয়ে ওঠাই ছিল সে যুগের তরুণদের বাসনা।

রাধানাথও এই দলে পড়লেন। কুসংস্কারের বাঁধ ছিন্ন করে সংস্কারপন্থীদের দলে ভিড়লেন।

রাধানাথ তখন হিন্দু কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ১৮৩২ সাল। সার্ভে অফিসের কাজের আহ্বান আসল।

কাজটি বিশেষ বড় নয়।

সামান্য কম্পিউটারের কাজ। বেতনমাত্র ত্রিশ টাকা। রাধানাথ সেই সামান্য চাকরি গ্রহণ করলেন। তাঁর উপরওয়ালা কর্মচারী ছিলেন জর্জ এভারেস্ট।

প্রতিভা কখনও ছাইচাপা থাকে না।

অল্পকালের মধ্যেই রাধানাথের কর্ম দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল।

ক্রমশ তাঁর পদোন্নতি হল এবং বেতন বাড়ল। এবং এই বেতন পরে ছয়শত টাকায় দাঁড়িয়েছিল।

সেকালের বাঙালীর পক্ষে রাধানাথের পদ মর্যাদা সামান্য ছিল না।

জরিপ সংক্রান্ত গণিতে রাধানাথের জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্ব এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়। তাঁর নির্ভুল গণনাতেই প্রথম ধরা পড়ে যে, এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯,১৪০ ফিট।

সার্ভের কাজে বিপদের সীমা নেই। বিশেষ করে এভারেস্ট শৃঙ্গের মত বিপদসঙ্কুল দুর্গম পর্বতের তো কথাই নেই।

রাধানাথের আবিষ্কারের পর তাঁর উপরওয়ালার নাম অনুসারে উচ্চ শৃঙ্গের নাম রাখা হয়েছে 'মাউন্ট এভারেস্ট'।

ভীরুতার কলঙ্ক বাঙালীর চিরকালের। যে অল্প কয়েকজন দুঃসাহসী বীর এই কলঙ্কের লজ্জা কিছু পরিমাণেও লাঘব করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাধানাথের নাম নিঃসংশয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৩ সালে রাধানাথের পিতৃ বিয়োগ হয়।

কিছুকাল পরেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের পর রাধানাথ সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অকৃত্রিম বন্ধু প্যারিচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হল।

এই পত্রিকায় রাধানাথের সহজ ভাষায় 'স্ত্রী-সন্দর্ভ' প্রকাশ হত।

এই প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, এভারেস্টের গর্বের আজ পর্যন্ত কোনো হানি ঘটেনি।

১৯১৫ সাল থেকে বিদেশী অভিযানকারী দল নিয়মিত ভাবে এতে হানা দিয়ে আসছেন। বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও বায়ুর অভাব দুঃসাহসী বীরদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ভীষণ হিমালয়ের হৃদয় এতে এতটুকুও গলে না।

শেষ পর্যন্ত মানুষ এভারেষ্টের চূড়ায় উঠিয়ে দিয়েছে জয়পতাকা।

॥ স্কটের দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার ॥

পৃথিবীর উত্তর সীমায় উত্তর মেরু ও দক্ষিণ সীমায় দক্ষিণ মেরু। মেরুতে সর্বদাই অত্যন্ত শীত। হাজার হাজার বছর ধরে কেবল বরফ জমে আছে।

একসঙ্গে ছ'মাস হয়ত সূর্যের আলোর দেখা পাওয়া গেল না। যখন সূর্য দেখা গেল তখন সূর্যের আলো বড়ই ক্ষীণ, উত্তাপও বড়ই মৃদু।

শীল, পেঙ্গুইন প্রভৃতি কয়েকটা প্রাণী ছাড়া সেখানে এত শীতে আর কোন জীবজন্তু বাস করতে পারে না। গাছপালা প্রভৃতি কোন উদ্ভিদ সেখানে জন্মাতে পারে না।

মেরুতে প্রায় ঝড় হয়—তাকে তুষার ঝটিকা বলে। সে অতি ভীষণ ব্যাপার।

তীব্রভাবে বাতাস বইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত হতে থাকে। এই ঝড়ের মুখে পড়লে আর রক্ষা নেই। শীতের বাতাসে, তুষারের স্পর্শে হাত অসাড় হয়ে যায়, দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন যায় থেমে।

ক্যাপ্টেন স্কট নামে একজন সাহসী ইংরেজ দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করবার জন্য বের হয়েছিলেন। মেরুর প্রান্তে উপস্থিত হয়ে ফিরবার পথে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ মেরুতে একদল লোক পাঠানো হবে বলে স্থির করা হল। ক্যাপ্টেন স্কট তখন নৌ বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। তাঁকে এই

অভিযানের দলপতি নিযুক্ত করা হল। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি সদলবলে জাহাজে চড়ে দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করলেন।

দক্ষিণ মেরু থেকে ফিরে এসে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে এলেন। সেবার মেরুর প্রান্ত ৫০০ মাইলও ব্যবধানে ছিল না। এঁর মত আর কেউ এতদূর যেতে পারেনি।

মেরু ভ্রমণ করবার পর ফিরে এসে তিনি যা বললেন, তাতে লোকে অনেক নতুন সংবাদ জানতে পারল। এর আগে লোকের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ মেরুও উত্তর মেরুর ন্যায় একটি মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

কিন্তু স্কট ফিরে এসে বললেন, দক্ষিণ মেরুর দিকে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ রয়েছে। সেই বিস্তীর্ণ মহাদেশের ওপর দশ-পনের হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী পর পর চলে গিয়েছে। তার মধ্যে বরফের নদী বয়ে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে চির তুষারে আবৃত উপত্যকা পর্বত-শৃঙ্গ নদী উপত্যকা সবই বরফে আচ্ছন্ন।

এই পথে চলতে স্কট অনেকবার অনেক বিপদে পড়েছিলেন। একবার পাহাড়ের ওপর থেকে স্কট দু'জন সঙ্গী নিয়ে বরফের নদীর দিকে নীচে নেমেছিলেন। তাদের তিনজনের কোমরে শক্ত দড়ি বাঁধা ছিল। দড়ির অপর প্রান্ত একখানা স্লেজের সঙ্গে বাঁধা ছিল। স্কট আর তার সঙ্গী একটু আগে চলছিলেন। চলতে চলতে হঠাৎ একটা ফাটলের মধ্যে তাঁরা পড়ে গেলেন। ফাটলের মুখে বরফ ঢাকা ছিল বলে তাঁরা এটা কিছুই বুঝতে পারেন নি। দড়িতে টান পড়তেই পিছনের স্লেজখানি ফাটলের মুখে এসে আটকে গেল। তখন দড়ি ধরে তাঁরা অতিকষ্টে ওপরে উঠে এলেন। স্লেজখানি ঐ ভাবে ফাটলের মুখে বেঁধে ছিল বলেই তাদের জীবন রক্ষা হল।

মেরুযাত্রীর জীবনে এইরূপ বিপদ প্রায়ই ঘটে। মৃত্যু তাদের নিত্য সহচর।

কাপ্তেন স্কট ইংলণ্ডে ফিরে আসলে সকলেই তাঁর কার্যের প্রশংসা করলেন। তাঁর পদোন্নতি হল।

একদিন ইংলণ্ডের লোক শুনে আশ্চর্য হলেন যে, কাপ্তেন স্কট তাঁর এত বড় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

তিনি দক্ষিণ মেরুর অভিযানের জন্য আয়োজন করতে লাগলেন।

প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হল।

নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, ওষুধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে জাহাজ পূর্ণ হল।

কয়েকজন অসীম সাহসী সহচরসহ ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ১লা জুন কাপ্তেন স্কট সমস্ত দেশবাসীর অভিনন্দন মাথায় নিয়ে যাত্রা করলেন।

সাত মাস সমুদ্রের ওপর জাহাজ চলল।

তারপর আর জাহাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। বড় বড় বরফের স্তূপ জাহাজের গতিরোধ করল। স্কট সদলবলে জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়লেন।

তাঁরা কখনো কঠিন বরফের ওপর দিয়ে, কখনও বা পাহাড়ের গা বেয়ে, কখনও স্লেজে, কখনও পদব্রজে ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন।

প্রায় ১ বছর ধীরে ধীরে মেরুর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তাঁরা একটি পর্বতের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করলেন।

সেখান থেকে তাঁদের গন্তব্যস্থান ১৭ মাইল। এই অবশিষ্ট পথ অতি ভয়ঙ্কর।

শীতের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ঐ পর্বতের ওপর তিনি স্থাপন করলেন শিবির।

চারজন সঙ্গী নিয়ে স্কট যাত্রা করলেন। অবশিষ্ট সঙ্গীদের ঐ শিবিরে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে বলে গেলেন।

একমাসের মধ্যে তাঁরা মেরু প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসবেন বলে জানিয়ে গেলেন।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী মেরুপ্রান্তে উপনীত হলেন।

কিন্তু সেখানে গিয়ে স্কট দেখলেন যে, সেই জনশূন্য প্রান্তরে নরওয়ে দেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে। এণ্ডারসন নামে নরওয়ের একজন সাহসী যুবক দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করতে বের হয়ে একমাস আগেই এই স্থানে এসে পৌছিয়েছিলেন। তাঁর পরিত্যক্ত শিবির তখনও দাঁড়িয়ে আছে এবং শিবিরের মধ্যে অনেক কাগজপত্র পড়ে আছে।

স্কট ফিরে চললেন।

এইবার প্রকৃতি তাঁর প্রতিকূল হয়ে উঠল। তাঁর সঙ্গীগণ ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর সঙ্গীদের উৎসাহ দিতেন। একদিন হঠাৎ তাঁর একটি সঙ্গী পড়ে গেল। সঙ্গীর মাথায় খুব আঘাত লেগেছিল। সেই আঘাতের ফলে সঙ্গীটি মারা গেলেন।

কয়েকদিন চলার পর হঠাৎ বাতাসের বেগ বেড়ে গেল, অত্যন্ত শীতও পড়ল। আর অগ্রসর হওয়া যায় না, প্রতি পদক্ষেপ সঙ্কটময় মনে হতে লাগল।

বায়ুর বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনে হল বাতাস বুঝি গায়ের মাংস কেটে নিচ্ছে।

এই অবস্থায় স্কট আর একটি সঙ্গী হারালেন। দুর্যোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শরীরও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে, তবু তারা চলেছেন।

সঙ্গে যে খাদ্য ছিল তাও নিঃশেষ, আর ১১ মাইল পথ চলতে পারলেই তারা শিবিরে পৌঁছতে পারেন। সেই শিবিরে অবশিষ্ট সঙ্গীরা তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। সেখানে খাদ্য, ওষুধ, বস্ত্র কোন জিনিসের অভাব নেই।

দুর্গম পথে হাজার মাইল তাঁরা অতিক্রম করেছেন, কিন্তু শেষ ১১ মাইল পথ আর শেষ হল না। ভয়ানক ঝড় উঠল, ঝড় থামল না—দিবারাত্র সমানভাবে তুষার ঝটিকা বইতে লাগল। খাদ্য ফুরিয়ে গেছে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন হয়ে গেছে। দুর্বল দেহ নিয়ে এই অবস্থায় আর কত দিন মানুষ বাঁচতে পারে? স্কটের সঙ্গী দু'জন আর সহ্য করতে পারল না।...

স্কট যখন বুঝলেন যে, জীবন রক্ষা করা অসম্ভব। তখন দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে তিনি কাগজে লিখলেন ঃ—

"একমাস আমরা যে কষ্ট পেলাম, কোন মানুষ বোধহয় তত কষ্ট পায়নি। দুঃখ নেই, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।...যদি বাঁচতাম তাহলে আমার সঙ্গীদের বীরত্ব ও সাহসের কথা দেশবাসীকে শোনাতে পারতাম।

কাপ্টেন স্কটের সন্ধানে যাঁরা বের হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর মৃত্যুর আট মাস পরে এই চিঠি ও স্কটের মৃতদেহ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

———

॥ উপগ্রহের নাম আর্যভট্ট ॥

১৯শে এপ্রিল ১৯৭৫ সাল।

ভারতীয় সময়ে দুপুর ১টা।

ভারতের প্রায় ৪০ জন বিজ্ঞানী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে মহাকাশে উঠিয়ে দেওয়া হল ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট।

পৃথিবীর যে অল্প কয়েকটি দেশ এর আগে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল ভারতের নামও তার সঙ্গে যুক্ত হল।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা আর একবার বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করলেন, বৈজ্ঞানিক যোগ্যতায় তাঁরা পৃথিবীর কোন দেশের চেয়ে হীন নন। সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিশ্বসভায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অমূল্য অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন আরেকবার।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরী 'আর্যভট্ট' উৎক্ষিপ্ত হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার কোন একটি স্থান থেকে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে। কারণ এত বড় উপগ্রহ মহাকাশে তুলে তাকে প্রয়োজনীয় গতি দিতে যে শক্তিশালী রকেট প্রয়োজন সে রকম রকেট এখনো ভারতে তৈরী হয়নি।

এই কথার মানে এই নয় যে, ভারত রকেট তৈরীর ব্যাপারে খুব পিছিয়ে আছে।

১৯৬২ সালে ভারতে তৈরী প্রথম রকেট আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

সে রকেটের নাম ছিল 'লাইক বাজন'।

উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল কেরলের থুম্বা নামক স্থান থেকে।

এ ব্যাপারে গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে।

যন্ত্রপাতি সমেত আর্যভট্টের ওজন ছিল ৩৬০ কিলোগ্রাম। এর মধ্যে শুধুমাত্র উপগ্রহের ওজন ৯০ কিলোগ্রাম। মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে ভারতের উপগ্রহটি সবচেয়ে ভারী।

এটি আবার সম্পূর্ণ গোলকের মত নয়, ২৬টি তলাবিশিষ্ট রকেটের মতো কাঠামোটি তৈরী করা হয়েছে বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়াম সংকর ধাতু দিয়ে।

এর উচ্চতা ১·১৭ মিটার, ব্যাস ১·৫৫ মিটার। পৃথিবীর অবস্থান থেকে ৫০·৪ ডিগ্রী হেলানো অবস্থায় এটি ঘুরপাক খেতে থাকবে।

একবার পাক খেতে সময় নেবে ৯৪·৪১ মিনিট, তার মানে দৈনিক প্রায় ১৬ বার এটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে। পৃথিবী থেকে আর্যভট্টের দূরত্ব ৬৫৪ থেকে ৬২৩ কিলোমিটারের মধ্যে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করবে ছ'মাস পর্যন্ত।

উপগ্রহটির মধ্যে এমন সব ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে মোট আশি মিনিট ধরে মহাকাশে যে সব তথ্য সংগ্রহ করবে তা পৃথিবীর বুকে অবস্থিত গ্রাহক স্টেশনে মাত্র আট মিনিটের মধ্যে সরবরাহ করে দেবে।

পৃথিবীতে যে দুটি গ্রাহক স্টেশন রয়েছে তার একটি হল দক্ষিণ ভারতের শ্রীহরিকোটায়, অপরটি মস্কোতে। শ্রীহরিকোটায় দৈনিক চারবার আর্যভট্ট খবর দেবে—প্রতিবারে আধ মিনিট করে।

আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশ উপগ্রহ তৈরীর ব্যাপারে ইতিপূর্বে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে।

এদের মধ্যে রাশিয়া ১৯০৭ সালে তাদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুৎনিক'-১ আকাশে উড়িয়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপরও রাশিয়া নানা কাজের জন্য কয়েক শ' কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের এক্সপ্লোরার-১ উড়িয়েছে ১৯৫৮ সালে।

ফ্রান্স উড়িয়েছে তাদের আস্তেথিনম ১৯৬৫ সালে। জাপান, চীন এবং বৃটেনও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। জাপানে ওসনি আকাশে উড়েছে ১৯৭০ সালে। চীনও তাদের উপগ্রহ আকাশে স্থাপন করেছে ঐ বছরেই।

পরের বছর বৃটেন তাদের এম্‌পেরো মহাকাশে তুলেছে। তবে কৃতিত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এদের মধ্যে রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নামই করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র তো ইতিমধ্যে কয়েকবার চাঁদের বুকেও বেড়িয়ে এসেছে।

ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে আর্যভট্ট।

নানা দিক দিয়েই এই নামকরণ উপযুক্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বারবার আমরা আর্যভট্ট বললেও নামটি নাকি আসলে আর্যভাট।

প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ছিলেন আর্যভট্ট। জন্ম তাঁর ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পাটলিপুত্রের কুসুমপুর নামক স্থানে। কর্মক্ষেত্র ছিল তার আধুনিক পাটনায়।

আর্যভট্টের সময়ে ভারতে চলেছে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল। সময়টা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত। মাত্র ২৩ বছর বয়সে আর্যভট্ট গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আর্যভট্টিয়। পৃথিবীর আবর্তন ছাড়া তিনি পৃথিবী, চাঁদ প্রভৃতির ব্যাস বার

করেছিলেন। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটিও তিনি দিয়েছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও অঙ্কে আর্যভট্টের নাম নিতান্ত কম নয়। আধুনিক বীজগণিতের ভিত্তিও রচনা করেছেন আর্যভট্ট।

তিনিই প্রথম দ্বিঘাত এবং অন্যান্য সমীকরণের সমাধান করেন।

ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও তাঁর অবদান রয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যের আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ব্যাপার।

এটা ভারতীয় গণিতজ্ঞদেরই দান। অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যের গুরুত্ব যে অনেকখানি সেটাও বলেছেন আর্যভট্ট।

আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেক সমস্যার সমাধানই খুঁজে বের করতে পারবে এই উপগ্রহ।

আবহাওয়ার সম্বন্ধে যাবতীয় খবরা-খবর গ্রহণ করে, সে সব কৃষির উন্নতি, নৌ ও বিমান চলাচল প্রভৃতির কাজে লাগানো যেতে পারে।

॥ মহাজাগতিক বিস্ময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র ॥

ইতালি দেশের পিসা শহরের এক গির্জার অভ্যন্তর।

ছাদ হতে একটা শিকল নেমে এসেছে। তার থেকে একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। ওপর দিকের জানলাগুলো খোলা, এক একবার হাওয়া আসছে আর ঝাড়টাকে দোলাচ্ছে। গির্জার মধ্যে একটা বালক বসেছিল আর ঝাড়ের দোলনটা লক্ষ্য করছিল।

তার মনে হল দোলনের বিস্তার বেশি বা কম হোক, দোলনকাল কেন একই। কিন্তু দোলনকাল কি করে মাপা যেতে পারে। এ হল তিনশ বছর আগেকার কথা। ঘড়ি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বালকটি খপ করে নিজের নাড়ীটা টিপে সময় নির্ধারণ করতে লাগল, আর দেখল সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই।

দোলনের বিস্তার যাই হোক···দোলনকাল সমান।

সতের বছরের গ্যালিলিও সেদিন বিজ্ঞানের এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করল।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবে নিল যে, নাড়ীর স্পন্দন নিয়ে যদি দোলনের দোলনকাল মাপা যায় তবে অন্যদিকে একটা দোলনের দোলনকাল লক্ষ্য করে নাড়ীর স্পন্দনকাল মাপা সম্ভব হবে। বেশিদিন গেল না, সে একটা ছোট যন্ত্র তৈরী করল যা দিয়ে নাড়ির গতি মাপা সম্ভব হল।

এই যন্ত্র ডাক্তারদের খুব কাজে লেগে গেল। গ্যালিলিওর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও গণিতজ্ঞ।

কিন্তু এসব চর্চায় পয়সা নেই ভেবে তিনি ছেলেকে কাপড়ের ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিলেন।

গ্যালিলিও দু'দিনেই দেখলেন সে কাজ তাঁর নয়। তিনি পিতাকে বুঝিয়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে গেলেন।

প্রাচীনকালে গ্রীক দেশের দার্শনিকরা যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন, হাজার হাজার বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই পড়ান হয়ে আসছিল। কিন্তু গ্যালিলিও ছাত্র হয়ে এসব তত্ত্ব বলতেই অধ্যাপকদের সঙ্গে তর্কে লেগে গেল।

এখনও পর্যন্ত গ্যালিলিও গণিতবিদ্যার বিশেষ কিছু জানতেন না।

এবার সুযোগ এলো।

এই সময় একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গণিতের ছাত্রদের কাছে কতকগুলো বক্তৃতা দিতে থাকেন।...

গ্যালিলিও গণিতের ছাত্র নন, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি ওই সব বক্তৃতা শুনে যেতেন।

শেষে একদিন সাহস করে তিনি অধ্যাপকের কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

অধ্যাপক গ্যালিলিওর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ছাত্র হিসেবে মেনে নিলেন।

অল্পকালের মধ্যে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বলে গ্যালিলিও প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

এর কিছুদিন পরে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন

অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁর বেতন হল সপ্তাহে মাত্র পাঁচ শিলিং।

এখন অধ্যাপকদের সঙ্গে গ্যালিলিওর ঠোকাঠুকি হতে আরম্ভ করল।

বহু শতাব্দী ধরে অ্যারিস্টটল বিজ্ঞানের যে সব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, নির্বিচারে লোকে সে সকল নিয়ম এতদিন মেনে আসছিল।

গ্যালিলিও বললেন, ও সবের কথা প্রত্যেকের যাচাই করে দেখতে হবে।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, একটা একশ পাউন্তের ওজন ও এক পাউণ্ডের একটা ওজন ওপর থেকে ছেড়ে দিলে একশ পাউণ্ডের ওজন একশ গুণ দ্রুত পড়বে।

গ্যালিলিও বললেন, বাজে কথা! তারা একসঙ্গে পড়বে।

১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে একদিন সকালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা ও অন্য অনেক দর্শক ঐ জায়গার বিখ্যাত আনত মিনারের পাদদেশে সমবেত হলেন।

গ্যালিলিও মিনারের ওপর উঠলেন ও সেখান থেকে একটা ছোট বল ও তার একশগুণ ভারী একটা বড় বল ওপর থেকে ফেললেন।

উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকেই দেখলেন যে, বল দুটি একসঙ্গে মাটিতে পড়ল। মাটিতে আঘাত করার শব্দও তারা শুনল।

এতদিন ধরে মানুষ যে ধারণা করে আসছিল, প্রকৃতি সুনিশ্চিন্ত ভাবে তার প্রতিবাদ করল।

কিন্তু নিজেদের চোখ-কান যাই জানাক—এই বলাবলি করতে করতে লোকেরা বাড়ি ফিরল—তা বলে কি শাস্ত্র বাক্য অমান্য করতে

হবে, গ্যালিলিওকে যে করেই হোক দাবিয়ে রাখা দরকার। আর তারা করলও তাই।

তখন নিউটন জন্মায়নি। তাঁর প্রবর্তিত গণিত বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু গ্যালিলিও পতনশীল পদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম প্রকাশ করলেন।

পিসাতে তাঁর শত্রুর সংখ্যা বাড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে তাঁকে ওখানকার চাকরি ছাড়তে হল। কিন্তু পাডুয়াতে তিনি এখানকার চেয়ে ভালো একটা চাকরি পেলেন।

পাডুয়াতে তিনি ১৮ বছর অধ্যাপকের কাজ করলেন, দেশময় তার যশ ছড়িয়ে পড়ল।

১৬০৯ সালে যখন তিনি একবার ভেনিসে গিয়েছেন, শুনলেন, লিপারেস নামে এক চশমা বিক্রেতা এক যন্ত্র তৈরী করছে, যা দিয়ে দূরের জিনিস দেখা যায়।

লিপারেসের যন্ত্র দেখবার চেষ্টা না করে গ্যালিলিও নিজে সেই রকমের এক যন্ত্র তৈরীর কাজে লেগে গেলেন।

একটা অর্গান পাইপ নিয়ে তার দুদিকে দু'খানা চশমার কাঁচ বসালেন, একখানা উত্তল পিঠ উঁচু লেন্স, অপরখানা অবতল পিঠ ঘষা লেন্স।

ব্যাস একটা দূরবীন হোল!

এই দূরবীনে দূরের জিনিস কাছে দেখাল। এ দিয়ে গ্যালিলিও অনেক নতুন নক্ষত্র দেখলেন ; খালি চোখে যাদের দেখা যায় না।

দিন দিন তিনি যন্ত্রের উন্নতি সাধন করতে লাগলেন।

একটা ভালো যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গ্যালিলিও আনন্দে অধীর হলেন।

এর আগে মানুষ কোনদিন যা দেখেনি, সে সব তাঁর দৃষ্টিপথে ধরা পড়ল।

চাঁদের ওই সব কালো কালো রেখা আমরা দেখি, সাধারণ লোকে যা চাঁদের কলঙ্ক বলে। গ্যালিলিও দেখলেন, সেগুলো ওখানকার পর্বতশ্রেণী, মাঝে মাঝে গভীর গর্ত।

পরিষ্কার রাত্রে দেখা যায় সমস্ত আকাশ জুড়ে এধার থেকে ওধার অবধি আলোর একটা ধারা যেন চলে গিয়েছে, একে বলা হয় ছায়াপথ।

গ্যালিলিও তাঁর তৈরী দূরবীক্ষণ নিয়ে লক্ষ্য করলেন যে ওটা বহু সংখ্যক নক্ষত্রের সমষ্টি।

আর কিছু নয়।

সূর্যকে যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ সুনিশ্চিন্তভাবে তা প্রমাণ করল।

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত বিফল হল।

এই সময়ে গ্যালিলিও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কেপ্‌লারকে লিখেছেন, প্রিয় কেপ্‌লার আমরা দু'জনে কাছাকাছি থাকলে খুব একচোট হেসে নিতুম। পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপককে দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নিরীক্ষণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলুম।

তিনি এলেন না, পাছে চোখে দেখে স্বীকার করতে হয় যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে।

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত সফল হল।

গ্যালিলিও বিচারকদের সামনে আনীত হলেন। অভিযোগ, শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার বিরুদ্ধ-কথা তিনি প্রচার করেছেন।

বলা বাহুল্য বিচারকদের মধ্যে একজনও বিজ্ঞানী ছিলেন না।

গ্যালিলিওর প্রতি আদেশ হল, তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারে বিরত থাকবেন। আর তা নাহলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে।

গ্যালিলিও প্রথমবার স্বীকৃতি দিয়ে চলে এলেন।

কিন্তু তিনি তাঁর কথা মানলেন না। যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রীয় মত খণ্ডন করে, নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করে তিনি এক পুস্তক প্রকাশ করলেন।

ফলে তাঁকে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হল। তবে লোকজন দেখা করার কোন বাধাই রইল না।

এখানে ইংলণ্ডের মহাকবি মিলটন গ্যালিলিওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

তাঁকে কবি বললেন, তাঁর বই ইংলণ্ডের বহুলোক আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছে।

অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হতে লাগল।

তিনি বধির হলেন।

শেষে দৃষ্টিশক্তি হারালেন।

দৃষ্টিহীন গ্যালিলিও বয়স আশির কাছাকাছি। তখনও গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন কি করে একটা দোলকের সাহায্যে একটা ঘড়ির চলার হার কমানো বাড়ানো যেতে পারে।

কিন্তু সেই নতুন ঘড়ি তৈরী হওয়ার আগেই ১৬৪২ সালের ৮ই জানুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

এর পরেও কথা আছে। তাঁর পুত্রকে দিয়ে ঘোষণা করলেন, তাঁর কবরের ওপর কোন সমাধি স্তম্ভ থাকবে না!

কারণ তিনি বন্দী অবস্থায় দেহত্যাগ করেছেন। তখন অবশ্য তা লোকে মেনে নিল, কিন্তু ভবিষ্যতে সংস্কারমুক্ত দেশবাসী সেখানে উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ করলেন।

আর আজকে পৃথিবীতে যে কেউ ঘড়ির একটি টিক শব্দ শোনে বা একটি দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে বহির্জগৎ নিরীক্ষণ করে সেই গভীর শ্রদ্ধায় গ্যালিলিওকে স্মরণ করে।

॥ ডায়নামো ॥

ইংলণ্ডে যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছেন, যেমন আইজাক নিউটন, চার্লস ডারউইন, লর্ড রাদার ফোর্ড ইত্যাদি তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁর মতো এমন সরল, সহজ ও সাধাসিধে বিজ্ঞানী খুবই কম জন্মগ্রহণ করেছেন।

মাইকেল ফ্যারাডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুব সাধারণ ও দরিদ্র পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন সোজা কথায় যাকে বলে কামার। কাকাদের মধ্যে কেউ ছিল মুদি, কেউ মুচি, কেউ চাষা আবার কেউ কেরানিও ছিল। তাঁর এক ভাই জলের কল সারিয়ে বেড়াত, অপর ভাইদেরও পরিচয় দেখার মত ছিল না। কিন্তু এই পরিবারের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডে কি রকম যেন অন্য স্তরের মানুষ হলেন।

বালক মাইকেলের লেখাপড়ায় খুব মনোযোগ ছিল না। কিংবা তাঁর বিশেষ কোন মেধাও ছিল না।

সবে মাত্র কিছু লেখাপড়া ও অংক শিখতে না শিখতেই তাঁকে—বিদ্যালয় ছাড়তে হয়।

মাইকেলের কথা বলার একটু দোষ ছিল। তিনি 'র' উচ্চারণ করতে পারতেন না। তিনি দাদাকে রবার্ট বলে ডাকতে পারতেন না। বলতেন 'ওবার্ট'। শিক্ষয়ত্রী কিন্তু এ জন্য ভীষণ চটে যেতেন —কি ছেলে যে ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না। এমন ছেলেকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া উচিত।

সত্য সত্যই তিনি নিজেই একদিন রবার্টকে একটি আইপেনি

দিয়ে বললেন যেন সে একটি বেত কিনে এনে তাই দিয়ে সকলের সামনে মাইকেলকে ভীষণ মারে।

রবার্ট কিন্তু ভাইকে ভালবাসতেন, সকলের মত নিষ্ঠুর সে ছিল না। সে সেই আইপেনি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে একেবারে মায়ের কাছে বাড়ী গিয়ে হাজির।

মাকে সব কথা বলাতে ফল হল এই যে, তিনি ছ'ভাইকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন।

এদিকে ফ্যারাডের অবস্থা তো একেই খারাপ ছিল, আরও খারাপ হয়ে পড়লো।

রবার্ট ও মাইকেলের বাবা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য লণ্ডনে এলেন।

কিন্তু স্থান পরিবর্তনে ভাগ্যের কোনই পরিবর্তন হল না। এই সময় মাইকেলকে একখানি মাত্র পাউরুটি নিয়ে এক সপ্তাহ কাটাতে হয়। তিনি সেই রুটিখানা চোদ্দটি ভাগ করে কেটে নিতেন, একখানি ভাগ সকালে আর একখানি ভাগ রাতে খেতেন। এই করে সপ্তাহ কাটাতেন। পেট না ভরলেও কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন।

মাইকেলের তের বছর হতেই তাঁর বাবা তাঁকে একটি কাজ জুটিয়ে দিলেন। কাজ হল বইয়ের দোকানে। লণ্ডনে ২নং ব্র্যাণ্ড কোর্ট ষ্ট্রীটের, জর্জ বিরোর এই বইয়ের দোকান প্রায় ফ্যারাডের মতোই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

জর্জ বিরো বই বিক্রয় করতেন। কাগজ কলম পেনসিল বিক্রি করতেন, বই বাঁধাতেন, আবার খবরের কাগজও বিক্রি করতেন।

মাইকেলের কাজ ছিল, গ্রাহকদের বাড়ী বাড়ী এই কাগজ পৌঁছে দেওয়া। আবার পড়া হয়ে গেলে ফিরিয়ে আনা।

এই কাজের জন্য মাইকেলকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত।

কিন্তু তিনি সবসময় হাসি মুখে সহ্য করতেন।

এক বছর কাজ করবার পর মাইকেলের মালিক মাইকেলের কাজে খুব খুশি হলেন। এবং তিনি মাইকেলকে দপ্তরীর কাজ শিখতে দিলেন।

ভাল কাজ দেখাবার জন্য পাওনা অর্থও তিনি মাপ করে দিলেন।

এই কাজটি মাইকেলের বেশ মনের মতো হলো। কারণ দোকানে নানা রকম বই বাঁধতে আসত, তিনি সেই সব বই পড়বার সুযোগ পেলেন।

বিজ্ঞানের বইগুলির প্রতিই তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হলেন।

তিনি শুধু বই পড়েই ক্ষান্ত থাকতেন না।

যে সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সস্তায় করা যায়, সেগুলো তিনি বাড়ীতে করতেন। এবং ছোট খাটো কয়েকটা যন্ত্র তিনি প্রস্তুত করে নিলেন।

একদিন লণ্ডনে ফ্রি-ষ্ট্রীট দিয়ে ফেরবার সময় একটি বিজ্ঞাপন মাইকেলের চোখে পড়ল।

বিজ্ঞাপনে ছিল 'টোটন নামে কোন এক বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। প্রবেশ মূল্য এক শিলিং। এই বক্তৃতা শোনবার জন্য মাইকেলের খুব আগ্রহ হল।

কিন্তু চাই অর্থ ও ছুটি। দুটোরই অভাব।

মাইকেলের আগ্রহ দেখে রিবো সাহেব তাকে ছুটি দিলেন। আর বড় ভাই রবার্ট তাকে অর্থসংগ্রহ করে দিলেন।

এই বক্তৃতা ফ্যারাডের খুব ভালো লেগেছিল এবং একজন বৈজ্ঞানিক হবার জন্য তাঁর মনে মনে খুব আগ্রহ হল।

রিবোর দোকানে দপ্তরীর কাজ দেখা শেষ হয়ে যেতে ফ্যারাডে সে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন।

এই সময় তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছিল। মাইকেলেরও আয় নেই। তাই তাঁদের পরিবারকে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হল।

"সফলতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কিন্তু কৃতকার্য হবে এমন আশা করো না।"

এই ছিল মাইকেল ফ্যারাডের জীবনের আদর্শ বাক্য।

এই আদর্শ বাক্য মনে রেখে মাইকেল ফ্যারাডে একদিন তখনকার বিলাতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার হামফ্রে ডেভীর কাছে একখানি চিঠি লিখলেন।

চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন একখানি সুন্দর খাতা।

মাইকেল ইতিমধ্যে হামফ্রে ডেভীর কিছু কিছু বক্তৃতা শুনেছিলেন।

সেই বক্তৃতা শুনে মাইকেল যা বুঝেছিলেন তাই তিনি বুঝিয়ে পরিষ্কার করে লিখে খাতাখানি বাঁধিয়ে হামফ্রে ডেভীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মাইকেল বিনয়ী ছিলেন……

কিন্তু ভীতু ছিলেন না।

তিনি অনুরোধ করলেন যে তাঁর ল্যাবোরেটরীতে তাঁকে যে কোন একটি কাজ দেওয়া হয়।

মাইকেল উত্তরের আশা করেন নি, কিন্তু উত্তর তো তিনি পেলেনই, সেই সঙ্গে চাকরি।

চাকরি হল ল্যাবরেটারীর মেঝে পরিষ্কার করা ও টেবিল চেয়ার ঝাড়া শিশি বোতল সাফ করা ও অন্যান্য ফাইফরমাস।

ফ্যারাডে কিন্তু এই চাকরিতেই খুশি একজন বিখ্যাত লোকের কাছে তো থাকা যাবে।

কিছুদিন পরে মাইকেলের আগ্রহ দেখে ডেভী সাহেব নিজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাঁর সাহায্য নিতে লাগলেন।

ফ্যারাডে খুব দ্রুত কাজ শিখে নিলেন।

ডেভী সাহেব খুব সন্তুষ্ট হলেন। এমনকি ইউরোপ ভ্রমণে ফ্যারাডেকে সহকারী রূপে নিয়ে যেতে রাজী হলেন।

এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের প্রধান প্রধান শহরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া।

ফ্যারাডে দীর্ঘ দু'বছর হামফ্রে ডেভীর সঙ্গে ভ্রমণ করলেন, নানা অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করলেন। সেই সঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিধি তার বেড়ে গেছে। তিনি নিজে এসে রয়েল ইনস্টিটিউটে একটি চাকরি পেলেন।

তিনি এখানে গবেষণা করবেন।

মাঝে মাঝে ছাত্রদের পড়াবেন।

তিনি যেন রয়েল ইনস্টিটিউটের যন্ত্রপাতি, রসায়নের বোতল আর টেস্টটিউবের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন।

এখানে কিন্তু তাঁর বেতন বেশী ছিল না। অথচ তিনি রয়েল ইনস্টিটিউটের কাজ এত ভালবাসতেন যে বেশী বেতনেরও সম্মানজনক কাজ অন্যত্র তিনি গ্রহণ করেননি।

এইখানেই কাজ করতে করতে তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার করেন চুম্বকের বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা।…

তাঁর সেদিনকার আবিষ্কারের ফলে ডায়নামো আবিষ্কার হল।

যার জন্যে আজ ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, রাস্তায় ট্রামগাড়ী চলছে।

মাইকেল ফ্যারাডে ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।

তাঁকে দেখে কিন্তু তা বোঝার উপায় ছিল না।

তাঁর সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে।

একদিন তিনি রয়েল ইনস্টিটিউটে কাজ করছেন। একজন নবীন বৈজ্ঞানিক সেখানে এল। সে কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডেকে চিনত না। ময়লা পোশাক পরা সেই বৃদ্ধ ফ্যারাডেকে দেখে নবীন বৈজ্ঞানিকটি জিজ্ঞাসা করল ঃ

"তুমি বুঝি এখানে অনেক দিন কাজ করছ ?"

"হ্যাঁ তা অনেকদিন বৈকি।"

"তুমি বুঝি এর ল্যাবোরেটারীর তদারক কর।"

"তা প্রায় সেই রকমই হবে।"

"মাইনে পত্তর ভাল পাও তো।"

"আর কিছু বেশী পেলে ভাল হয়।"

"বেশ, বেশ, তা তোমার নাম কি।"

"মাইকেল ফ্যারাডে।"

॥ বিজ্ঞান বিচিত্রায় নব উন্মেষ ॥

আমাদের পুরাণে সুন্দর একটি গল্প আছে।

মা দুর্গার দুই ছেলে। গণেশ আর কার্তিক। গণেশ বড়ো, কার্তিক ছোট। গণেশের ঘাড়ে হাতির মুখ। চোখ দুটি ছোট ছোট, আর বিরাট লম্বা শুঁড়। সহজ সাদাসিধে ছেলে গণেশ। কোনো ঝামেলায় যেতে চায় না। মাকে ভারি ভালবাসে। কার্তিক কিন্তু ঠিক উল্টো। যদিও সে মাকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু তাঁর দুরন্তপনায় মা একেবারে ভীষণ অস্থির।

একবার মা দুর্গা তাঁর ছেলে দুটিকে ডেকে বললেন, যাও তোমরা দু'জনে একবার গোটা পৃথিবীটা ঘুরে এসো। বড় হয়েছো, সুতরাং তোমরা নিজেকে জানবার চেষ্টা কর।

ব্যাস, কথা ফুরোতে যা দেরী। সঙ্গে সঙ্গে কার্তিক তাঁর বাহন ময়ূরে চেপে বেরিয়ে পড়লেন বিশ্ব পরিক্রমায়। কত দুর্গম পাহাড়, কত নদনদী, কত গভীর অরণ্য, কত বিস্তীর্ণ মরুভূমি, এইসব পেরিয়ে কার্তিক চললেন তো চললেনই। পথ যেন আর ফুরোয় না। এদিকে গণেশ— !

গণেশ তাঁর বিশ্ব পরিক্রমায় ওসব ঝামেলার মধ্যে গেলেন না। এমনকি বাহন ইঁদুরকেও নেবার প্রয়োজন মনে করলেন না। মায়ের চারপাশে এক পাক ঘুরে টুক করে গিয়ে বসলেন মায়ের কোলে। অর্থাৎ ভাবখানা এই, মাকে যে জেনেছে, তার আবার বিশ্বকে জানবার প্রয়োজন কি? মায়ের স্নেহ যে পেয়েছে, বিশ্বের সব সম্পদই তার অধিকারে, সুতরাং তার আর চিন্তা কি? আসলে গণেশ হলেন তত্ত্বজ্ঞানী, দার্শনিক, সাধক, উপাসক। এটা মানব সভ্যতার একটি বিশেষ দিক।

কার্তিক কিন্তু এ সব তত্ত্ব কথার ধার ধারেননি। তিনি সভ্যতার আরেক দিক! তাই বিশ্ব পরিক্রমা আজো চলছে। আজো। ময়ূর আজো দেশ-দেশান্তরে আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। ময়ূরপঙ্খী রঙ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। কার্তিক এগিয়ে চলেছেন আরো এগিয়ে!

পুরাণে এই যে গল্পটা আছে, এটা ঠিক নিছক গল্প নয়। এখানে কার্তিকের যে রূপ আমরা দেখতে পাই, এ রূপ কার্তিকের নয়, তা বিশ্বজয়ী মানুষদের। অজানাকে জানবার,- দুর্গমকে জয় করবার বা দুঃসাধ্যকে হাতের মুঠোয় আনবার আগ্রহ মানুষ ছাড়া আর কারো ছিল না। তাই সে কেবল যাত্রী নয়, চিরযাত্রী···।

কী আকাশের রহস্য, কি পৃথিবীর ওপরের রহস্য—সব কিছুই একদা পাগল করে তুলেছিল চিরযাত্রী মানুষকে। এই রহস্য উন্মোচনের জন্য মানুষ সেই প্রথম আবিষ্কারের দিন থেকে এগিয়ে গেল একটু একটু করে। অরণ্যকুন্তলা পৃথিবীকে দেখল সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরল সে এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষ। অনেক পুরুষ। গাছে গাছে ঘষা লেগে কেমন করে আগুন জ্বলে ওঠে, সেজন্য নিজেই চাক্ষুষ করল। দেখল দাবাগ্নির লেলিহান শিখরে কেমন করে বনের পর বন পুড়ে যায়। আর সে আগুন দেখে বড়ো বড়ো জন্তুগুলি কত অসহায়ভাবে প্রাণ রক্ষার জন্য পালিয়ে বেড়ায়, তাও সে দেখল। এই সব দেখতে দেখতে আগুনের ব্যবহার শিখে ফেলল মানুষ। শুধু ব্যবহার নয়, শিখল আগুন সংরক্ষণ করতে; এই আগুন জ্বালিয়ে সে কেবল নিজেই বাঁচল না, বন্যজন্তু তাড়ান এবং পরে রান্না করা মাংস পর্যন্ত খেতে শিখল।

অন্য জন্তু জানোয়ারের মত এদিকে মানুষ সহজাত ভাবেই শিখেছিল শিকার করতে। কিন্তু বন্য ভালুকের মত তার না ছিল নখের ধার, না ছিল দাঁতের শক্তি, না গায়ের জোর। বেচারি মানুষ

পশু শিকার করতে বেরিয়ে তাই প্রায়ই অন্য পশুর শিকারে পরিণত হয়ে যেত। এই অসহায় অবস্থা কাটাতে মানুষ প্রথম ব্যবহার করতে শিখল তার দুটি হাত। এর থেকে পাথর ছুঁড়ে সে পশু বধ করতে এগোল। এই পাথরের পর আবিষ্কৃত হলো লোহার ধনুক ও শাণিত তীর। সেদিন এরা হল মানুষের সঙ্গী। না, এ সব আবিষ্কার একদিনে হয়নি। এ সব জিনিস মানুষ আবিষ্কার করেছে অনেক যুগের সাধনায়। এই ভাবেই মানুষ একদিন হয়েছে গোষ্ঠীবদ্ধ। যাযাবর জীবনে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা শিখেছে ঘর বাঁধতে। শিকার ছেড়ে বেছে নিয়েছে কৃষিকাজ।...অর্থাৎ মানুষরূপী কার্তিক এইভাবেই চলেছেন চিরযাত্রীর ভূমিকা পালন করে। নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে।

এই পরিবর্তনগুলি আমরা এক এক কথায় সেরে নিচ্ছি বটে, কিন্তু কোনোমতেই ভুললে চলবে না মানববেতিহাসে এগুলি একেবারে বিরাট আবিস্কার। বিরাট। অরণ্যচারী মানুষ ঘর বাঁধতে যেমনই শিখল, সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে আরম্ভ হল লোকালয়। গড়ে উঠতে আরম্ভ হল জনপদ। তৈরী হল সমাজ। তৈরী হতে থাকল মানুষের ভাষা, দর্শন, ধর্ম এবং শেষ কালে সংহিতা। আর বিজ্ঞানও সর্বদাই রয়েছে তার বুদ্ধির জগতে। এক মুহূর্তের জন্যও এই বিজ্ঞান মানুষকে বসে থাকতে দিল না। মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল এ দেশ থেকে আরেক দেশে। ঘরে বসেও তার ঘুম নেই, আকাশের তারায় তারায় সে দেখতে পায় কি যেন সংকেত! ঐ দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, তবু ঐ তারার আলোয় চাপতে মানুষ তার নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়। এইভাবে ধীরে ধীরে মানুষ একদিন তার জ্ঞানের ভাণ্ডারে এক এক করে অজস্র মণিমাণিক্য জমা করে ফেলল।

গগনচারীরা একে একে মানুষের হিসাবের খাতায় ধরা দিতে থাকলেন। চাঁদ সূর্য তো বটেই, খুঁজে খুঁজে নক্ষত্রদের ঠিকুজী কুষ্ঠি

মানুষ তৈরী করে ফেলল। আয়ত্ত করে ফেলল সে আকাশে ওড়ার চিন্তা। এইভাবেই মানুষ পৃথিবীটাকে নিয়ে এলো মুঠোর ভেতর। ওপরের আকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে দুস্তর নদী ও দুর্গম সমুদ্রকেও জয় করে ফেলল। নদীতে সে ভাসাল নৌকা এবং সমুদ্রে ভাসাল জাহাজ। তারপর একদিন ডুবো জাহাজ তৈরী করে জলের অতলে ডুব দিয়ে মণিমুক্তোর জন্য সে বাড়িয়ে দিল হাত।

অবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা এই ভাবেই চলল মানুষের ইতিহাস হাত ধরাধরি করে।

যে কাহিনী দিয়ে আমরা আরম্ভ করেছি সে প্রসঙ্গে আবার আসা যাক···তাই মানুষ কোন সময়েই স্থির নেই···বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে সে এগিয়ে চলেছে···তবু সে চলেছে, তার পদধ্বনী আমরা শুনতে পাচ্ছি···দিক থেকে দিগন্তে।
